"আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমার উপর বিশ্বাস করে, সে মরলেও জীবিত হবে"। (যোহন ১১: ২৫)

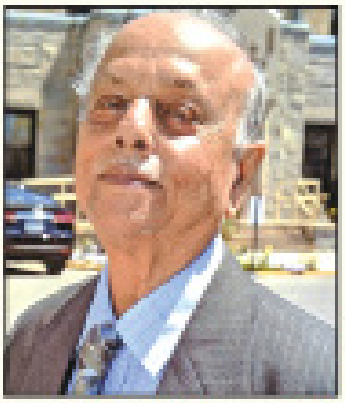

বাবা: সিরিল ডি রোজারিও
জন্ম : ৩ মার্চ, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: ধমুন, নাগরী মিশন
মৃত্যু : ১০ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
নিউইয়র্ক, আমেরিকা

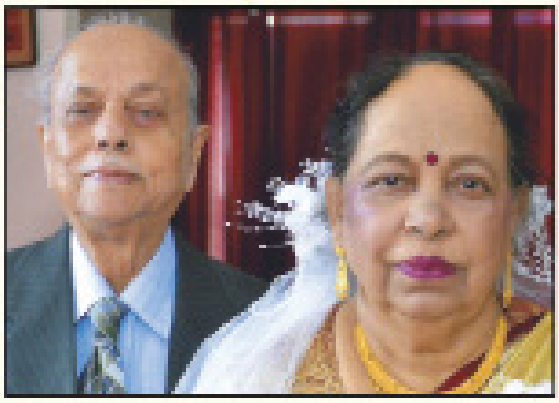

মা: মারীয়া রোজারিও
জন্ম : ৭ আগস্ট, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : তিরিয়া, নাগরী মিশন
মৃত্যু : ১ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
নিউইয়র্ক, আমেরিকা

স্মৃতিতে তোমরা অম্লান

দিন আসে দিন যায়, সময় বয়ে যাচ্ছে কিন্তু বাবা-মায়ের চলে যাওয়ার ক্ষণটি যেন আরো বেশি করে জীবন্ত হয়ে ধরা দিচ্ছে। শুধু মনে হয় এইতো সেই দিন বাবা-মা বলে ডাকলে সাড়া দিতো, তোমাদের হাসিমাখা মুখটা চিক চিক করে উঠে। তোমাদের স্নেহমাখা উত্তরটা কানে বাজে। কেমন করে এক বছর হয়ে গেল, ফিরে এলো ১ ডিসেম্বর, মায়ের চলে যাওয়া। কষ্ট করে বিশ্বাস করতে হয় বাবাও আমাদের ছেড়ে ২ বছর আগে স্বর্গে পারি দিয়েছেন। শুধু স্মৃতি। বাবা-মা তোমরা দু'জনেই ছবি হয়ে গেলে। তোমাদের ছেলে-মেয়ে, বৌমারা, নাতি-নাতনীরা, গ্রেট নাতি-নাতনীরা সকলেই তোমাদের অনুপস্থিতি মিস করছে।

তোমরা দু'জনে আমাদের আশীর্বাদ করো যে তোমাদের আদর্শে আমরা যেন চলতে পারি, তোমাদের সরলতা, সততা, ধৈর্য, নিষ্ঠার আদর্শ যেন আমাদের সকলের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, আমাদের সকলের প্রার্থনা, ঈশ্বর যেন তোমাদের আত্মাকে চির শান্তি দান করেন।

শোকাহত সন্তানগণ,

সমর, স্বপন, সুবাস, সুধীর এবং চিত্রা

মৃত্যু করে অমৃত দান

প্রয়াত ইমেল্ডা গমেজ
জন্ম: ৯ মার্চ, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৪ জানুয়ারি,২০১২ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত সিস্টার মেরীয়ান তেরেজা গমেজ সিএসসি
জন্ম: ২৭ নভেম্বর, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৫ জুন, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

"নয়ন তোমারে
পায়না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে"
- (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

প্রাণপ্রিয় মা ও দিদি,
দেখতে দেখতে আবারও এসে গেল মা তোমার বিদায়ের দিন। দিদিকে হারিয়েছি তারও এগার বছর হয়ে গেল। আপাত দৃষ্টিতে তোমাদের না দেখলেও তোমরা কিন্তু আমাদের চোখে চোখে রয়েছ। তোমাদের প্রতিটি কথা কাজ আজও আমাদের আবেগাপ্লুত করে। যে আদর্শ রেখে গেছ আমাদের জন্য, দেশ ও দশের জন্য তা যেন আমাদের মাঝে সুফল বয়ে আনে। আমাদের আশীর্বাদ করো যেন আমরা সবাই স্বর্গে মিলিত হতে পারি। পরম পিতা তোমাদের অনন্ত শান্তি দান করুন।

তোমাদেরই স্নেহধন্য
নরু, সুজান এবং শোকার্ত গমেজ পরিবার।

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা

আপনার তথ্য হালনাগাদ করুন

দ্রুত সেবা গ্রহণ ও মরনোত্তর জটিলতা পরিহার করার জন্য ঢাকা ক্রেডিটে আপনার নিম্নলিখিত তথ্য নির্দিষ্ট ফরমের মাধ্যমে হালনাগাদ করুন।

- নাম
- জন্ম তারিখ
- ঠিকানা
- কর্মস্থলের তথ্য
- টেলিফোন নম্বর
- বৈবাহিক ও পারিবারিক তথ্য
- নমিনি
- ই-মেইল আইডি
- ভোটার আইডি

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আজই নিকটস্থ প্রধান কার্যালয় বা সেবাকেন্দ্রে আসুন।

০১৭০৯৮১৫৪২২

পংকজ গিলবার্ট কস্তা
প্রেসিডেন্ট

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি

এলিজাবেথ মনিকা গমেজ (আদি)

বিশেষ কৃতিত্ব

এলিজাবেথ মনিকা গমেজ (আদি) গত মে মাসে ২০২২ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের Rutgers University হতে Bachelor of Science-এ গ্রাজুয়েশন করেছে। এলিজাবেথ Public Health এবং Psychology Major নিয়ে ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে তার Undergrad সম্পূর্ণ করেছে।

এলিজাবেথ বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটির প্রখ্যাত Memorial Sloan Kettering Cancer Hospital-এ কর্মরত আছে। এলিজাবেথ তার এই সাফল্যের জন্য পরম পিতা পরমেশ্বরের কাছে চির কৃতজ্ঞ এবং সকলের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থী। আমরা তার এই কৃতিত্বের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই এবং আগামী দিনগুলোতে সে যেন আরো সাফল্যতা অর্জন করতে পারে এর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা যাচ্না করি।

অনেক অনেক
শুভেচ্ছা
ও
অভিনন্দনসহ-

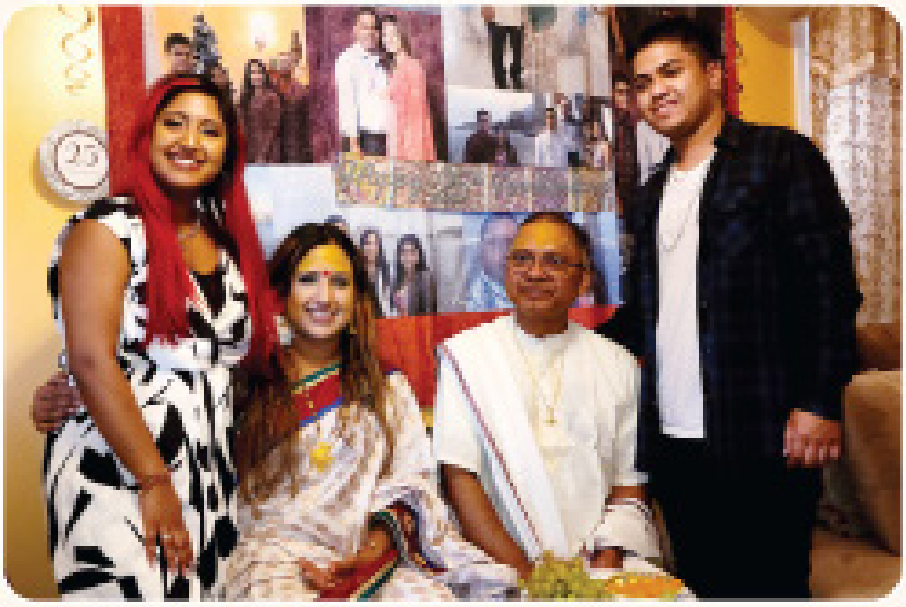

বাবা-মা : জেম্‌স ও সুইটি গমেজ (আদি)
ছোট ভাই : খ্রীষ্টফার গমেজ (আদি)
ঠাকুর দাদা : রবার্ট গমেজ (আদি)
ঠাকুর মা : স্বর্গীয়া এলিজাবেথ শেফালী গমেজ
নানু ও দিদা : এন্থু কার্বারী ও মনিকা গমেজ
জেঠা : ফাদার স্ট্যানলী গমেজ (আদি)
এবং সকল কাকা-কাকীমা, মাসী- মেসো, মামা ও সকল ছোট ভাই-বোনেরা

Bayonne, New Jersey, USA
আদির বাড়ী, ছোট গোল্লা, গোল্লা বর্মণপাড়া
ঢাকা-বাংলাদেশ।

ফা: চার্লস জে. ইয়াং ফাউন্ডেশন

১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

রেজি নং: S-13463/2020

আমাদের সাফল্য ও অবদান

কোভিড কালীন সময়ে ১৭০০ পরিবারের মধ্যে খাদ্য ও সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান
৪০০টি পিপিই প্রদান
১০ জন দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তি প্রদান
১৭০০ পরিবারের মধ্যে কোভিড কালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা প্রদান
২ জন মৃত্যু পথযাত্রীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান
৫০০ জন যুবক-যুবতীকে জীবন দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান
১৫৫১৮ পরিবারের মধ্যে জরীপ কার্য পরিচালনা করা

চলমান কার্যক্রমসমূহ

১০০ জন শিশুদের নিয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (ইসিসিডি) কার্যক্রম শুরু করা
২০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান

উপরোক্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আপনাদের আর্থিক সহযোগিতা কামনা করছি

আমরা সমস্যাগ্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রগতির প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সহায়তা পাঠানোর ঠিকানা

নির্বাহী পরিচালক, ফা: চার্লস জে. ইয়াং ফাউন্ডেশন
ই-মেইল: info@fryoungfoundation.org
মোবাইল নম্বর: +৮৮০১৩২১-১৬৯৭০০

Bank info: Fr Charles J. Young Foundation, A/C No- 0073600877, Bank Asia Limited, Scotia Branch

৮ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত পারুল ডরোথি গমেজ

স্বামী : প্রয়াত খ্রীষ্টফার গমেজ
জন্ম : ১৬ মার্চ, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
পারুল ভিলা, ৩০/১ পূর্ব রাজাবাজার
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

প্রিয় মা, তুমি আমাদের মাঝে নেই এ কথা যেন বিশ্বাস করতে আজও কষ্ট হয়। তোমার প্রতিটি কাজ, তোমার স্পর্শ আমাদের আজও ঘিরে রেখেছে। আমাদের মা ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ, স্নেহশীল, কর্তব্যনিষ্ঠা, সাহায্যকারিণী, ঈশ্বর নির্ভরশীলা নারী। মানুষের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করে, নিরবে-নিভৃতে থেকে তিনি অন্যকে সাধ্যমত সহযোগীতা করেছেন। তার শুভানুধ্যায়ীরা এখনো আমাদের মাকে স্মরণ করেন।

আমাদের মা মিসেস পারুল ডরোথি গমেজ ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৪ প্রভুর কোলে আশ্রয় নেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

মা, দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল ৮টি বছর তোমাকে ছাড়া। সর্বদা মনে হয় আমাদের কাছেই আছো। আমাদের বিশ্বাস, তুমি স্বর্গীয় পিতার আশ্রয়ে পরম শান্তিতে আছো এবং আমাদের আশীর্বাদ করছো।

তোমার আত্মার শান্তি কামনায়

ছেলে ও ছেলে-বৌ : বাবু মার্কুজ গমেজ-মার্সিয়া মিলি গমেজ
মেয়ে ও মেয়ে-জামাই : আলো, জোৎস্না-অজিত, উজ্জ্বলা-তপন
নাতি : অভিষেক ইম্মানুয়েল সি গমেজ
নাতনী ও নাত-জামাই : ডায়না-মার্টিন, বৃষ্টি-তেজিত, রাত্রি, স্বপ্ন, সৃষ্টি, বিস্ময়, স্পর্শ
পুতি : কাব্য, অনিক ও আনন্দ

২৬তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত এলিজাবেথ শেফালী গমেজ

জন্ম: ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
গোল্লা, ঢাকা

মৃত্যু: ২৯ অক্টোবর, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ
নিউ জার্সি, ইউএসএ

"আমার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়েছে। খ্রিস্টের পক্ষে আমি প্রাণপণে যুদ্ধ করেছি, দৌড়ের খেলায় শেষ পর্যন্ত দৌড়েছি এবং খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাসকে ধরে রেখেছি।" -২য় তিমথি ৪:৭

পৃথিবীর চির আবর্তনে তুমি এসেছিলে আমাদের একান্ত কাছে, অতি আপনজন হয়ে। তেমনিভাবে ভালোবাসা, মায়া-মমতার সকল বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেছ আমাদের একা করে বহুদূরে। বছরান্তে আবার ফিরে এসেছে সেই বেদনাসিক্ত স্মৃতিময় ২৯ অক্টোবর, যেদিন তুমি চলে গেছো আমাদের ছেড়ে। পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমাকে স্বর্গীয় চিরশান্তি দান করুন।

শোকাহত পরিবারবর্গ

স্বামী : রবার্ট গমেজ (আদি)

সন্তানগণ : ফাদার ষ্ট্যানলী, জেমস্-সুইটি, জেভিয়ার-ভুলি, অলড্রিন-ন্যান্সি, জুয়েল-লতা মাইকেল-মনি ও নোয়েল-চৈতি।

নাতি-নাতনী : এলিজাবেথ মনিকা, রবার্ট যোনাস, খ্রীষ্টফার নিকোলাস, এড্রিয়া সুজানা, যোয়ানা ভিক্টোরিয়া, যোনাথন রিচার্ড, এইডেন খৃষ্টান, এ্যান্থনী এবং ব্যান্ডন গমেজ (আদি)।

শুভ বড়দিন ও নববর্ষ উপলক্ষ্যে সকলকে জানাই আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

PAUL ROZARIO
26-August-1934
to
07-January-2013

Beloved husband, father, grandfather and renowned social leader. It's been 9 years since we lost you, but your presence is still fresh and great driving force to our lives.

TERESA ROZARIO
08-June-1937
to
07-May-2022

Beloved wife, mother and grandmother. We greatly miss her presence, wisdom and direction to our everyday life. Teresa Rozario was extremely hard working, raising her 3 sons and 5 grandchildren with love and passion which will be never forgotten. We miss you mom.

We will love both of you forever.

On behalf of your bereaved family

SON: DOMINIC ROZARIO ([illegible])
WIFE: JACQUELINE ROZARIO ([illegible])
GRAND SON: ALEXANDER PAUL ROZARIO
GRAND DAUGHTER: JANE CATHERINE ROZARIO

SON: ALOYSIUS ROZARIO ([illegible])
WIFE: SCOLASTICA ROZARIO ([illegible])
GRAND SONS: VICTOR CHRISTOPHER ROZARIO ([illegible])
CORNELIUS ADRIEL ROZARIO ([illegible])

SON: CLEMENT ROZARIO ([illegible])
GRAND DAUGHTER: ANGELINA SAMANTHA ROZARIO

ADDRESS: D.C.C.- 379 SOUTH KAFRUL,
DHAKA CANTONMENT, DHAKA- 1206

আসন্ন বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী এর পাঠক-পাঠিকাসহ সকলকে কারিতাস বাংলাদেশ
এর পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

- কারিতাস অর্থ "দয়ার কাজ" বা "সর্বজনীন ভালবাসা"।
- কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার আলোকে কারিতাস বাংলাদেশ এমন একটি সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন লালন করে, যে সমাজ মুক্তি ও ন্যায্যতা, শান্তি ও ক্ষমাশীলতার মূল্যবোধসমূহকে ধারণ করে এবং সবাই মিলে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্মানের সাথে মিলন সমাজে বসবাস করে।
- কারিতাস বাংলাদেশ মানুষের সহযোগী হতে চায়: বিশেষতঃ সেইসব মানুষের-যারা সমাজে গরীব ও প্রান্তিক জীবনাবস্থায় আছে। সবার প্রতি সম-মর্যাদার দ্বারা কারিতাস এমন একটি সমন্বিত উন্নয়ন অর্জন করতে প্রয়াসী যার লক্ষ্য হলো: মানব-মর্যাদা নিয়ে মানুষ সত্যিকার মানুষের মতো জীবন যাপন করবে এবং অপরকে দায়িত্বশীলতার সাথে সেবা করবে।
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কারিতাস সকল মানুষের সাথে কাজ করে।

কারিতাস বাংলাদেশ
২ আউটার সার্কুলার রোড
শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭

আন্তর্জাতিক নজরুল সংস্থা অগ্নিবীণা (ভারত) সম্মাননায় ভূষিত
বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, গবেষক ও আধ্যাত্মিক কবি ড. অগাস্টিন ক্রুজ।

তাঁর এই পদক প্রাপ্তিতে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে ইতিমধ্যে তাঁর ২৫টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে,
যার মধ্যে ৫টি ইংরেজি ভাষায় রচিত।

লেখকের আরও ৩০টি বই প্রকাশের অপেক্ষায়।

জ্ঞানকোষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলো পাওয়া যাচ্ছে –

১. জ্ঞানকোষ, ১০-১১ মমতাজ প্লাজা, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।
২. ফরিদা কর্পোরেশন, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৭।
৩. জ্ঞানকোষ, এ.আর প্লাজা, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৭।
৪. প্রতিবেশী প্রকাশনী (তেজগাঁও, সিবিসিবি, নাগরী ও লক্ষীবাজার)।

কেএসবি আবাসন প্রকল্প:

☞ আকর্ষণীয় মূল্যে এপার্টমেন্ট বুকিং চলছে।

☞ আকর্ষণীয় মূল্যে প্লট বুকিং চলছে।

আমাদের অন্যান্য প্রকল্প সমূহ:

- কেএসবি সমবায় বাজার
- কেএসবি বেকারী
- কেএসবি জীম
- কেএসবি বিউটি পার্লার
- কেএসবি পরিবহন ও এম্বুলেন্স সার্ভিস
- কেএসবি বাণিজ্যিক ভবন
- কেএসবি বিল্ডার্স
- কেএসবি রিসোর্ট (প্রস্তাবিত)

মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড
মঠবাড়ী, উলুখোলা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

শিকড়ের সন্ধানে

পলিকার্প ললিত ও মালতী গোমেজ

জ্ঞান হবার পর থেকে জেনে এসেছি আঠারোগ্রামের অধিবাসীদের অধিকাংশের আদিবাস ছিল পদ্মা নদীর পারে দোহার উপ-জিলার অরিকুল, নারিশা, মেঘলা, মালিকান্দা, নাগেরকান্দা, ঝনকি, সুতারপাড়া, ঈকড়াশী গ্রামে এবং ফরিদপুর পরগনার নরিকুল এবং তুইতালের কাছে বকচরে। মোঘল বাদশাহ শাহ আলমের আমলে (১৭৫৯-১৮০৬) তার সাম্রাজ্যের সময় বাংলায় পাঁচটি জমিদারির মধ্যে একটি জমিদারির নাম ছিল হুসাইনাবাদ যার অর্থ ফুলের বাগান। এই হুসাইনাবাদই বর্তমানের হাসনাবাদ। সেই সময় বাংলার সুবেদার ছিলেন মহব্বত খাঁ এবং তার অধীনে এই হুসাইনাবাদ জমিদারির নায়েব ছিলেন শ্রী বিষ্ণু চন্দ্র তিওয়ারী। তিনি ভারতের লাক্ষ্মেণা প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। সেই সময় একজন পর্তুগীজ আগস্তিনিয়ান সংঘের রোমান কাথ লিক পুরোহিত খ্রিস্টধর্ম প্রচার করার জন্য হাসনাবাদ এলাকায় আসেন। তার নাম ছিল Father Raphael Dos Anjos. নায়েব বিষ্ণু চন্দ্র তিওয়ারী ফাদার আঞ্জুসকে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে বাঁধা দেন, কিন্তু ফাদার ঐশবাণী প্রচার করতেই থাকেন। নায়েবের আদেশ অমান্য করার কারণে নায়েব ক্ষুব্ধ হয়ে শ্রদ্ধেয় ফাদারকে মেরে ফেলার জন্য তার হাত পা বেঁধে গভীর এক কুপের মধ্যে ফেলে দেয়।

মোঘল নায়েবের পিত্তশূলের ব্যথা ছিল। নায়েবর স্ত্রী ধর্মভীরু মানুষ ছিল। তিনি নিয়মিত পূজা অর্চনা করতেন। এদিকে যেদিন পুরোহিতকে গভীর কুপে ফেলে দেওয়া হয়, ঠিক সেইদিন থেকেই নায়েবের পিত্তশূলের ব্যথা চরম আকার ধারণ করে। উপায়অন্তঃ না দেখে নায়েবের স্ত্রী স্বামীকে বাঁচাতে সারারাত পূজা অর্চনা করে। গভীর রাতে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। তা হলো, শুভ্রবসনা এক নারী নায়েবের স্ত্রীকে দর্শন দিয়ে বলেন, "তোমার স্বামী যদি কুপ থেকে পুরোহিতকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে, তা হলে সে পিত্তশূল রোগ থেকে মুক্তি পাবে।"

নায়েবের স্ত্রী এই কথা স্বামীকে বলে এবং পুরোহিতকে কুপ থেকে তুলে আনার জন্য অনুরোধ করে। নায়েব উত্তরে বলে, তিনদিন পূর্বে পুরোহিতকে কুপে ফেলে দেওয়া হয়েছে, সে কি আর বেঁচে আছে? কিন্তু পুরোহিত বেঁচে ছিলেন। স্ত্রীর অনুরোধে অনেক লোকের উপস্থিতিতে পুরোহিতকে কুপ থেকে তোলা হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য! পুরোহিত সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন এবং তার পরণের কাপড়-চোপড় সব শুকনো ছিল। পুরোহিতকে কুপ থেকে তোলার সাথে সাথে নায়েবের পিত্তশূলের ব্যথা ও যন্ত্রণা কমতে থাকে এবং আস্তে আস্তে সে সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নায়েব পুরোহিত Father Raphael Dos Anjos কে হাসনাবাদে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে এবং গির্জাঘর তৈরি করতে অনুমতি প্রদান করে।

পুরোহিত Raphael Anjos 1777 খ্রিস্টাব্দে বর্তমান গির্জার জায়গার চারিদিকে বাঁশের খুঁটি পুঁতে, চারিদিকে বাঁশের বেড়া এবং তার উপর ছনের চাল দিয়ে একটি গির্জাঘর স্থাপন করেন এবং তা "জপমালা রাণীর" নামে উৎসর্গ করেন। এই বাঁশ ও ছনের ঘরই হাসনাবাদের প্রথম গির্জা যা ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে তৈরি করা হয়েছিল এবং এখানেই এলাকার খ্রিস্টে দীক্ষিত লোকজন তাদের ধর্মচর্চা শুরু করেছিলেন। খ্রিস্টমণ্ডলী তথা কাথলিক ধর্মবিশ্বাসের বীজ আঠারগ্রামে রোপিত, অংকুরিত ও বিকাশ লাভ করেছিল। এই বাঁশের খুঁটি ও বেড়া দিয়ে তৈরি করা গির্জার জায়গায়ই ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান পাকা গির্জা তৈরি করা হয়। নরিকুল, বকচর, নাগেরকান্দা ও মালিকান্দা থেকে খ্রিস্টানরা হাসনাবাদ ও তুইতালে এসে বসতি স্থাপন করেন।

অতঃপর নায়েব বিষ্ণু চন্দ্র তিওয়ারী এই ঘটনার মাধমে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠার পর ফাদার জধঢ়যধবষ এর উপর অনেক সন্তুষ্ট হন এবং মোঘল বাদশাহ শাহ আলমের হুসাইনাবাদ জমিদারিটি মাদ্রাজের মাইলাপুরের মহামান্য বিশপের (His Excellency Dom Henrique José Reed da Silva, Bishop of Mylapore) নামে স্বর্ণপাত্রে দানপত্র লিখে দিয়ে সপরিবারে নিজের দেশ লাক্ষ্মোতে চলে যান। উক্ত দানপত্র লেখা স্বর্ণপাত্রটি রোমের রক্ষণাগারে সংরক্ষিত আছে। তখন থেকেই হুসাইনাবাদ জমিদারি মাদ্রাজের মাইলাপুরের মহামান্য বিশপের অধীনে চলে আসে। পরবর্তীতে নায়েবের থাকার কুঠিরটি পর্তুগীজ মিশনারি ও পুরোহিতদের থাকার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর জমিদার ফাদারের বাড়ীটি এক সময় পোস্ট অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হত। বর্তমানে সেখানে মেয়েদের জন্য হাইস্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সময় এদেশের সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মাদ্রাজের মাইলাপুর Diocese এর অধীনে ছিল এবং সেখান থেকেই সব কিছু পরিচালিত হতো। মাইলাপুর দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুর রাজধানী মাদ্রাজে (চেন্নাই) অবস্থিত। পাকিস্তান আমলে এক সময় হাসনাবাদ গির্জায় পালপুরোহিত ছিলেন তামিল ফাদার কচুভেলিকাকুম এবং গোঁয়ানিজ ফাদার মস্সিনিওর ইসিদোর দা কস্তা। তেজগাঁওতে ছিলেন তামিল ফাদার আণ্ডাচেরি।

জানা যায়, আমাদের ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় আগস্তিনিয়ান সংঘের পুরোহিতগণ তেজগাঁও এ ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে "পবিত্র জপমালা রাণীর" নামে গির্জা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে নাগরীতে সাধু নিকোলাস এবং ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে হাসনাবাদে "জপমালা রাণীর" গির্জাটি নির্মাণ করা হয়। এভাবে খ্রিস্টমণ্ডলী তথা কাথলিক ধর্মবিশ্বাসের বীজ পূর্ববঙ্গে রোপিত, অংকুরিত ও বিকাশ লাভ করেছিল। হাসনাবাদ গির্জার প্রথম পাল-পুরোহিত ছিলেন পর্তুগীজ আগস্তিনিয়ান পুরোহিত ফাদার রাফায়েল গোমেজ।

মাইলাপুরের মহামান্য বিশপ হাসনাবাদ জমিদারিটি পর্তুগীজ আগস্তিনিয়ান পুরোহিতদের মাধ্যমে পরিচালনা করতেন। পরবর্তীতে একই সাথে এই জমিদারি এবং খ্রিস্টভক্তদের পরিচালনা করা একজন পুরোহিতের পক্ষে অসম্ভব হওয়াতে, মাইলাপুরের মহামান্য বিশপ এই জমিদারিটি পরিচালনা করার জন্য একজন পৃথক পুরোহিতকে নিযুক্ত করেন। সেই শ্রদ্ধেয় পুরোহিতের নাম ছিল ফাদার ম্যানেজেস (Fr. Menejes). তৎকালীন ঢাকা অঞ্চলে তিনটি খ্রিস্টান জমিদারি ছিলঃ হাসনাবাদ, নাগরী এবং তেজগাঁওয়ে। আর এই সব জমিদারী ছিল মাদ্রাজের মাইলাপুরের বিশপের অধীনে। মাইলাপুর থেকেই সবকিছু পরিচালিত হতো।

মাইলাপুর এবং সাধু টমাস

মাদ্রাজের এই মাইলাপুরের ক্যাথিড্রালে (Cathedral) যিশু খ্রিস্টের বার (১২) শিষ্যের এক শিষ্য সাধু টমাসের কবর ও ব্যাসিলিকা আছে। (Saint Thome Cathedral, also known as St. Thomas Cathedral Basilica and National Shrine of Saint Thomas). It was built in the 16th century by the Portuguese explorers over the Tomb of Saint Thomas. এখানেই সাধু টমাসের শরীরের সমস্ত হাড়গোড় (Remains of St.Thomas) সংরক্ষিত আছে।

According to legend Saint Thomas, one of the twelve disciples of Jesus, arrived at Muziris in present-day Kerala State in South India from the

Roman province of Judea in A.D. 52 and preached between A.D. 52 to A.D 72, when he was martyred on St.Thomas Mount.

It is claimed that Saint Thomas's apostolic ministry in India took place specificallz at Cranganore along the Malabar Coast in Kerala, South India from 52 A.D to 68 A.D. His journey through Kerala is said to have resulted in numerous conversions. After spending 10 years on the Malabar Coast, he is said to have travelled Eastwards across the Deccan Plateau, arriving in Mylapore, Madras in 68 A.D. The cave at little mount is claimed to be his favourite preaching spot. A 2000 year old never drying, a miraculous stream of water on a rock face are said to be examples of the apostle's divine exploits. A church atop St.Thomas mount was built by Portuguese in 1547 to mark the spot. It was on this St. Thomas Mount that the apostle was said to be killed by a lance which pierced through his back.

সাধু টমাসকে একটি পাহাড়ের (St. Thomas Mount) উপর যে স্থানে প্রার্থনা রত অবস্থায় হত্যা করা হয়েছিল সেই স্থানটিতে আমাদের যাওয়া ও দেখার সুযোগ হয়েছিলো। সেখানে খুব সুন্দর একটা চ্যাপেল আছে। সাধু টমাস যে ক্রুশটা নিয়ে ধর্ম প্রচার করেছেন, কাঠের সেই ক্রুশটাও ঐ চ্যাপেলের বেদীতে আছে, আমাদের ক্রুশটা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। আর যে পাথরের গুহায় সাধু টমাস আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং গুহার পাথর ভেঙ্গে পিছন দিক দিয়ে বেড়িয়ে গিয়েছিলেন যেখানে তার হাত ও পায়ের ছাপ এখনো আছে, আমরা তাও দেখেছি। সেখানে একটা পানির ফোয়ারা আছে যেখান থেকে দিন রাত ২৪ ঘণ্টা পানি বের হয়।

সাধু টমাসের তীর্থ স্থানের এক যায়গায় ক্রুশবিদ্ধ যিশুর বড় একটা মূর্তি আছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তার কোন ছবি তোলা যায় না। ক্যামেরা তার ছবি ধারণ করতে পারে না। সেখানে লেখা আছে, "পবিত্র স্থান"। আমরা অনেক ছবি তুলেছিলাম, কিন্তু সব ফাঁকা।

হাসনাবাদের জমিদারি

হাসনাবাদের জমিদারি বিস্তৃত ছিল দোহার এবং পদ্মা নদীর পাড় পর্যন্ত। সেখানকার খ্রিস্টান গ্রামগুলি এই জমিদারীর অধীনে ছিল। হাসনাবাদ থেকেই এই জমিদারী দেখাশোনা ও পরিচালনা করা হতো। জমিদারী থেকে তোলা খাজনা-পাতি সব মাইলাপুরের বিশপের কাছে পাঠানো হতো।

পরবর্তীতে আগস্তিনিয়ান পুরোহিত ম্যানেজেস (Fr. Menejes) হাসনাবাদ থেকে তেজগাঁওয়ে বদলি হন এবং তার স্থলাভিষিক্ত হন আগস্তিনিয়ান সংঘের ফাদার ফ্রান্সিস ডি'ক্রুজ। তিনিও একজন গোয়ানিজ পুরোহিত ছিলেন। তিনি খুবই সাহসী ও বিচক্ষণ এবং আইন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। খুব দক্ষতার সাথে তিনি জমিদারী পরিচালনা করেছেন। অত্র এলাকায় তিনি জমিদার ফাদার নামে পরিচিত ছিলেন। আমরা তাকে জমিদার ফাদার বলেই ডাকতাম।

আঠারগ্রামে সাদা মিশন ও কালা মিশন

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ রাজার সাথে পোপের ৫০ বছরের চুক্তি সমাপ্ত হয়, ফলে পর্তুগালের রাজা ফারদিনান্দের (Ferdinand) প্রাচ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। পোপ ষোড়শ গ্রেগরী ইংরেজ জেজুইট (Jesuit) Father Robert Lezar কে বঙ্গের ভিক্টরিয়েট (Victoriate) করে কোলকাতায় প্রেরণ করেন। আগস্তিনিয়ান পাদ্রীগণ এতে রুষ্ট হয়ে পোপের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। চব্বিশ পরগনার আদালতে ৫০ বছর এই মামলা চলে। অবশেষে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে পোপের সাথে পর্তুগালের রাজার এক আপোষরফা হয়। সেখানে পর্তুগীজ আগস্তিনিয়ান পাদ্রী সমাজের অধীনে মাইলাপুরের সব জমিদারী এবং কোলকাতা, ঢাকা, তেজগাঁও, নাগরী ও হাসনাবাদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এইসব মিশনগুলোকে 'সাদা' বা 'ধলা' মিশন নামে অভিহিত করা হয় কারণ আগস্তিনিয়ান পাদ্রীগণ সাদা পোশাক পরিধান করতেন। আর কোলকাতার ভিক্টরিয়েট Father Robert Lezar এর অধিনে গোল্লা, শুলপুর ও বক্সনগর কে রাখা হয় এবং তারা 'কালো' বা 'কুজর মিশন' নামে চিহ্নিত হতে থাকে কারণ জেজুইট পাদ্রীগণ কালো পোশাক পরতেন।

পাদ্রী সমাজের বিভক্তির কারণে আঠারগ্রাম খ্রিস্টান সমাজ বিভক্ত হয়ে পরে। দুই সমাজের মধ্যে সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়, কলহ ও বিচ্ছিন্নতা দুই সমাজের মধ্যে এক বৈরী অবস্থার সৃষ্টি করে। এর মধ্যে হাসনাবাদের পালপুরোহিত কালো মিশনের খ্রিস্টভক্তদের তাদের গির্জায় যাওয়া বন্ধ করে দেন। তখন ছোট গোল্লা গ্রামের কালু মাতব্বরের মিস্ত্রী, বাড়ীতে রবিবাসরীয় উপাসনা শুরু করা হয়। এই কালু মাতব্বরের জ্যেষ্ঠ সন্তান পিটার গমেজই পরবর্তীতে পবিত্র ক্রুশ (Holy Cross) সংঘের প্রথম পুরোহিত হয়েছিলেন। কিন্তু অতি অল্প বয়সে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে এক অস্ত্রোপ্রচারের পর কোলকাতার ক্যাম্বেল হাসপাতালে তিনি মারা যান। এই মিস্ত্রী বাড়ীতে আবার কালু মাতব্বর, স্বর্গের রাণী (RNDM) সম্প্রদায়ের ৮ জন সিস্টারদের স্থান দিয়েছিলেন এবং ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ওই সিস্টারগণ গোল্লায় "সাধ্বী থেকলার" নামে একটি প্রাথমিক স্কুল চালু করেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে বান্দুরা-গোবিন্দপুর হলি ক্রস হাইস্কুল হওয়ার আগে গোল্লায় সিস্টারদের তৈরি সাধ্বী থেকলার এই স্কুলই ছিল আঠারগ্রামের একমাত্র খ্রিস্টান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে উল্লেখ্য যে, বান্দুরা-গোবিন্দপুর হলিক্রস হাইস্কুলটি গোবিন্দপুরেরই ছিল। গোবিন্দপুরের হিন্দু জমিদার স্কুলটি যাতে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হয় সেজন্য স্কুলটি হলি ক্রশ (Holy Cross) সংঘের ব্রাদারদের কাছে হস্থান্তর করেন। হলি ক্রশ সংঘ স্কুলটি গোবিন্দপুর থেকে বান্দুরায় স্থানান্তর করেন এবং স্কুলের নামকরণ করেন বান্দুরা-গোবিন্দপুর হলি ক্রশ স্কুল। পরে স্কুলটিকে হাইস্কুলে উন্নীত করা হয়। স্কুলটি হলি ক্রশ ব্রাদারদের দ্বারা পরিচালিত হয়। বর্তমানে গোবিন্দপুর নামটি বাদ দেওয়া হয়েছে এবং স্কুলটিকে কলেজে উন্নীত করা হয়েছে।

হাসনাবাদ গির্জায়ও এক সময় রোববারের খ্রিস্টযাগ বন্ধ হয়ে যায়। তখন নয়নশ্রী গ্রামের দুখাই মাষ্টারের বাড়ীতে রোববারের প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হতো। অবশেষে বান্দুরায় ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে ইট, সুরকি, কাঠ দিয়ে হলি ক্রশ ফাদারগণ 'সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের' নামে একটি গির্জা নির্মাণ করেন। পরবর্তিতে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ সেই গির্জা গোল্লায় স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ টর্নেডোতে সেই গির্জা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। পরে গোল্লায় নতুন করে ক্রুশের আকারে একটা গির্জা তৈরি করা হয়েছে। গির্জাটি তৈরি করেছেন তখনকার পাল পুরোহিত নয়ানশ্রী গ্রামের প্রয়াত ফাদার ডমিনিক রোজারিও, CSC

বঙ্গদেশে প্রথম পর্তুগীজদের বসতি

সে আজ অনেক দিনের কথা। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মের এক সকালে ভারতের পশ্চিম উপকুলে কালিকাট (Kalicut, Kerala) বন্দরে এসে উপনীত হলেন পর্তুগীজ অভিযাত্রী Vasco-Da-Gama. সে দিনের তার সেই পালতোলা জাহাজে করে সমগ্র আফ্রিকার উপকুল প্রদক্ষিণ করে তিনি ভারতে এসে পৌছান। তার সঙ্গে ছিল মাত্র ১৬০ জন নাবিক। সেদিন ভারতবাসিগণ সানন্দে তাদের গ্রহণ করেছিলো এই বিদেশি অতিথিদের।

পর্তুগীজ মিশনারীগণ ঠিক কোন সময়ে প্রথম বাংলাদেশে এসেছিলেন, তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এটা জানা যায় যে, ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে João da Silvera নামে একজন পর্তুগীজ নাবিক চারটি জাহাজের বহর নিয়ে গোয়া থেকে চট্টগ্রামে এসেছিল। সে ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে প্রথম পর্তুগীজ কারখানা (factory) তৈরি করে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করেছিলেন।

পর্তুগীজরা ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে ব্যান্ডেলে বসতি স্থাপন করেছিলো। পর্তুগীজ বনিকেরা ভারতে এসেছিল মুলত ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য।

জাতি হিসাবে পর্তুগীজরা সৎ কাথলিক। ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের সাথে সাথে তারা চেয়েছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে। এজন্য তারা নৌকাযোগে সাথে করে নিয়ে এসেছিল ধর্মপ্রচারকদেরও। পর্তুগীজ ব্যবসায়ীরা হুগলীর সপ্তগ্রামে বসতি স্থাপনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রচারকগণও সেখানে প্রচারের কাজ শুরু করেন। প্রথমে এসেছিলেন সাধু আগস্তিন (Saint Augustin) সংঘের ধর্মব্রতীগণ। তাদের অনুসরণ করলেন যথাক্রমে যিশু সংঘ (Jesuit) ও ডমিনিকান সংঘের (Dominican) ধর্মব্রতীগণ।

ব্যান্ডেল ভারতের হুগলী জেলার হুগলী নদীর পারে অবস্তিত। পর্তুগীজ ধর্ম প্রচারকরা সেখানে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করে এবং "মাতা মেরীর" নামে ব্যান্ডেলে একটা গির্জা তৈরি করেন। সেই গির্জাই পরবর্তী কালে "মাতা মেরীর ব্যাসিলিকা" (Basilica of the Holy Rosary) নামে পরিচিতি লাভ করে। হুগলী নদীর পারে মাতা মেরীর ব্যাসিলিকা অবস্থিত।

ব্যান্ডেলে অলৌকিক মূর্তি:

ব্যান্ডেলের প্রধান আকর্ষণীয় বস্তু হচ্ছে গির্জার উচ্চ বহির্ভাগের অলিন্দে স্থাপিত মাতা মারীয়ার মূর্তি। তাকে বলা হয় "শুভ যাত্রার মাতা" হুগলীর ব্যান্ডেলে যখন এই গির্জা নির্মাণ করা হয়, তখন গির্জায় এই মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে খ্রিস্টানরা ব্যান্ডেলে এসে বসতি স্থাপন করে। এক সময় ব্যান্ডেলে পর্তুগীজ এবং বাঙালি মিলে অনেক খ্রিস্টান লোক বাস করতো। এখনও ব্যান্ডেলে অনেক খ্রিস্টান লোক বসবাস করে।

পরবর্তী ত্রিশ বছরের মধ্যে পর্তুগীজগণ ব্যান্ডেলে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি লাভ করে। পর্তুগীজদের আচার ব্যাবহারে সন্তুষ্ট হয়ে এদেশিয় অধিবাসীরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হতো। এইভাবে বঙ্গদেশে পর্তুগীজদের প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকায় মোঘল শাসকগণ চিন্তিত হয়ে পরল। তারা ভাবল, হয়তো পর্তুগীজরা অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গদেশ অধিকার করে নেবে। এইভাবে ভবিষ্যৎ সংঘের সূচনা হয়।

ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন তার পুত্র যুবরাজ খুররম। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন এবং বর্ধমানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি জানতেন, পর্তুগীজগণ কেমন দুঃসাহসী এবং সুদক্ষ যোদ্ধা, আর সেজন্য তিনি তাদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। এর পরিবর্তে প্রচুর ধন-রত্ন এবং ভবিষ্যতে নানা প্রকার সুযোগ-সুবিধা দানের অঙ্গীকারও করেছিল। পর্তুগীজদের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের মিত্রতা ছিল, তাই বিদ্রোহী রাজপুত্রকে সাহায্য করতে পর্তুগীজ অধ্যক্ষ রাজী হলেন না। তৎকালীন পর্তুগীজ শাসন কর্তা ছিলেন মিগেল রদ্রিগেস (Miguel Rodrigues). এই ঘটনার সময় ছিল ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দ। ক্রুদ্ধ হলেন যুবরাজ খুররম। পর্তুগীজদের ভাগ্যাকাশে নেমে এল বিপদের কালোমেঘ।

মোঘল আক্রমন (Moghul Invasion)

১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর যুবরাজ খুররম ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি শাজাহান (Shah Jahan) নাম ধারণ করেন। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সময় পর্তুগীজগণ তাকে সাহায্য করেনি, উপরন্তু তার অভিষেকের সময় হুগলীর পর্তুগীজরা কোন দূত তার দরবারে পাঠায়নি। এর ফলে পর্তুগীজদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন সম্রাট শাজাহান। সম্রাট শাজাহান পর্তুগীজদের প্রতি বহুদিন ধরে যে আক্রোশ মনে পোষণ করে আসছিলেন, তার ফলশ্রুতিতে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ এবার উপস্থিত হল। যুদ্ধ ঘোষণা করে পর্তুগীজদের ধ্বংস করতে তিনি দৃঢ় সংকল্প করলেন।

বাংলার নবাব কাশিম খাঁ ছিলেন সম্রাট শাজাহানের অন্তরঙ্গ বন্ধু। সম্রাটের আদেশে ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুন নবাব কাশিম খাঁ ব্যান্ডেল আক্রমণ করেন পর্তুগীজ ও খ্রিস্টানদের ধ্বংস করার জন্য। মোঘল সৈন্যরা কামান দিয়ে ব্যান্ডেল গির্জা উড়িয়ে দিয়েছিল। পর্তুগীজগণ প্রাণপণে বাঁধা দেয়। মোগলরা প্রথমে ব্যান্ডেলের উত্তরাংশে অবস্থিত যিশু সংঘ (Jesuit) ফাদারদের বাসগৃহগুলি ধ্বংস করে এবং ফাদারদের হত্যা করে। তাদের মৃতদেহগুলি কবর দেয়া হয়। কিছুদিন পর মুসলমানগণ এই সব কবর খোঁড়ে। অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, কবরের মধ্যে তিনটি মৃতদেহ অবিকৃত অবস্তায় পাওয়া যায়। এরা হচ্ছেন Jesuit ফাদার পেদ্রে গোমেজ (Pedro Gomes), ফাদার বেনেদিক্ত রদ্রিগেজ (Benedicto Rodrigues) এবং ফাদার গাসপার ফেরেরা (Gasper Ferera)। এই অলৌকিক ঘটনা স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব বিস্ময় ও উদ্দিপনার সৃষ্টি করে।

আগস্তিনিয়ান পাদ্রীগণ প্রায় ৪,০০০ (চার হাজার) খ্রিস্টভক্তকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন এবং ৬টি জাহাজে করে চট্টগ্রাম হয়ে নোয়াখালীতে বেশ কিছু লোকদের নামিয়ে দিয়ে বাকিদের ফরিদপুর পরগনার জমিদার রাজা রাজবল্লভের রাজধানী নরিকুলে স্থান করে দেন। ক্রমে কীর্তিনাশা পদ্মা নদী নরিকুলকে গ্রাস করাতে সেখানকার বাঙালি খ্রিস্টানগণ পদ্মা পাড়ি দিয়ে দোহারের মেঘলা, মালিকান্দা, অরিকুল, নারিশা, নাগেরকান্দা, ঝনকি, সুতারপাড়া, ঈকড়াশী গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করে। মালিকান্দায় তারা জপমালা রাণীর নামে একটা গির্জা ও কবরস্থান তৈরি করেন। গির্জার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি, কিন্তু কবরস্তানের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।

আঠারো গ্রামের অধিকাংশ খ্রিস্টানগণ ছিল হুগলী পরগণার অধিবাসী। মোঘলদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে হুগলীর খ্রিস্টানরা প্রাণের ভয়ে প্রথমে ফরিদপুর এবং এর আশেপাশের এলাকায় পালিয়ে আসে। ফরিদপুরেও নিজেদের নিরাপদ মনে না করে তারা পদ্মা নদী পাড়ি দিয়ে দোহারের অরিকুল, নারিশা, মেঘলা, মালিকান্দা, নাগেরকান্দা, ঝনকি, সুতারপাড়া, ঈকড়াশী গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু পদ্মা ভাঙনের ফলে তারা হাসনাবাদ, তুইতালের বকচর, শোলপুর, মুশুরিখোলা এবং ভাওয়াল অঞ্চলে গিয়ে বসতি স্থাপন করে।

হাসনাবাদ থেকে ২০০ খ্রিস্টান নবাবগঞ্জের ধাপারি গ্রামে এসে বসতি শুরু করেছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে স্থানীয় মুসলমানদের সাথে তাদের ঝগড়া বিবাদ বাঁধে এবং এক রাতে সব খ্রিস্টানদের বাড়ী-ঘর মুসলমানরা জ্বালিয়ে দেয়। সর্বস্ব হারিয়ে খ্রিস্টানরা তখন হাসনাবাদ জমিদারের স্মরণাপন্ন হয়। বাংলার সুবেদার মহব্বত খাঁ কঠোর হস্তে সেই দাঙ্গা নির্মূল করেন এবং খ্রিস্টানদের বালিডিয়র, গোল্লা, বান্দুরা, দেওতলা গ্রামে বসতি করার জন্য জমি পত্তনি দেন। ধাপারিতে এখন কোন খ্রিস্টান নাই। সেখানকার খ্রিস্টানদের বাস্তুভিটা, জমিজমা সব বিক্রি করে দিয়েছে, নতুবা বেদখল হয়ে গেছে। হাসনাবাদে বসতি গড়ার আরও ১০ বছর পরে খ্রিস্টানরা নদীর অপর পাড়ে নয়ানশ্রী, রাহুৎহাটি ও পুরান তুইতালে বসবাস করা শুরু করে।

মুশুরিখোলা

মুশুরিখোলা ধলেশ্বরী নদীর পশ্চিম-উত্তর পাশে। সেখানে কয়েকটি গ্রাম যেমন নোলাগরিয়া, বটতলী, কদমুলি, ঝাওচড় ও কলাতিয়া ছিল। সেই সময় ওই যায়গায় অনেক খ্রিস্টান লোক বসবাস করতো। ষোড়শ/সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে খ্রিস্টমণ্ডলী তথা কাথলিক ধর্মবিশ্বাসের বীজ মালিকান্দা, বকচর ও মসুরিখোলায় রোপিত, অংকুরিত ও বিকাশ লাভ করেছিল। যতটুকু জানা যায়, মুসুরিখোলা সাভার বাজার থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণে ধলেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে পর্তুগীজ আমলের কাথলিকগণ বাস করতেন কিন্তু ধলেশ্বরী নদীর ভাঙ্গনে সব জমিজমা হারিয়ে এদের অনেকে সাভার ও তুইতাল (বকচর) অঞ্চলে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। বর্তমানে মসুরিখোলায় মাত্র দুইটি প্রটেস্টান্ট পরিবার আছে। মসুরিখোলার কাছে "ফিরিঙ্গিকান্দা" নামেও একটি স্থান আছে। কিন্তু বর্তমানে সেখানে কোন খ্রিস্টান নেই। বালিডিয়র মুন্সী পরিবার ঢাকা থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রথমে এই মুশুরিখোলায় বসতি স্থাপন করেছিল। পরে প্রথমে ছোট গোল্লা পুরাতন লঞ্চ ঘাঁটের পশ্চিম পাশে বসতি স্থাপন করেছিল। সে বাড়ী ইছামতি নদী ভেঙ্গে নিয়ে যাওয়ায় তারা বালিডিয়র গ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। বালিডিয়রে এখন পাঁচটি মুন্সী বাড়ী আছে। বাড়ী আছে কিন্তু মানুষ নেই।

মুন্সী পরিবারের অধিকাংশ লোক ভারতে বসবাস করছে। বর্তমানে বালিডিয়র গ্রামে মাত্র দুইটি বাড়ী আছে যেখানে মুন্সী পরিবারের লোকজন বাস করে।

মালিকান্দায় কবরস্থান পরিদর্শন

বিভিন্ন সামাজিক ও প্রাকৃতিক কারণে পদ্মা পারের খ্রিস্টান লোকজন ধীরে ধীরে বর্তমান আঠারোগ্রামের গ্রামগুলিতে অবস্থান নেয় এবং কালক্রমে স্থায়ীভাবে সেখানে বসতি গড়ে তোলে। খ্রিস্টানদের অবস্থানকালে ঐ গ্রামগুলি ছিল বর্ধিষ্ণু জনপদ এবং খ্রিস্টানদের অত্র এলাকায় যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এই সবই গ্রামের মুরুব্বিদের কাছ থেকে শোনা। আমাদের অনেকেরই মনে মনে একটি সুপ্ত বাসনা ছিল, পদ্মাপাড়ের ঐ গ্রামগুলিকে দেখা, যেখানে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এক সময় সপরিবারে বসবাস করতো।

মালিকান্দা পরিদর্শনে গিয়ে সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় শতবর্ষের অধিক পুরাতন এক খ্রিস্টান কবরস্থান, যা এখনো সম্পূর্ণ বেদখল হয়ে যায় নাই। সাথে পাওয়া যায় একটি স্কুল। হাল আমলে নির্মিত ২৮ নম্বর মালিকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের পাশেই শতাব্দী প্রাচীন এই স্কুল ঘরটি কালের সাক্ষী হয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছে। সেখানকার প্রবীণেরা এটাকে ফিরিঙ্গী স্কুল হিসেবেই জানে। এই স্কুলটা যে মানুষটা তৈরি ও দান করেছেন তার নাম প্রয়াত আদু গোমেজ। আদু গোমেজ এলাকার ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য নিজের বাড়িতেই এই স্কুলটা করেছিলেন সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগেই। পরবর্তীতে আদু গোমেজ বাড়ীসহ স্কুলটা সরকারকে দান করে দিয়েছেন। মালিকান্দা কবর স্থানে যে কবরটা আমরা দেখতে পাই, সেই কবরটাও এই আদু গমেজের। কবরস্থানের পাশেই এক মুসলমান খালার বাড়ী। এই খালাই আমাদের ঐ কবরস্থান দেখাশোনা ও পরিচর্যা করতেন যত দিন তিনি জীবিত ছিলেন। এখন তার ছেলে এই কবরস্থান দেখাশোনা ও পরিচর্যা করেন।

দেরিতে হলেও আঠার গ্রাম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (অঃযধৎড়মৎধস উবাবষড়ঢ়সবহঃ ঈবহঃৎব (অউঈ) আঠারোগ্রামের অতীত ঐতিহ্য উদ্ঘাটন, সংরক্ষণ ও বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থান মূল্যায়নের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে। তারা আঠারোগ্রামের প্রতিটি খ্রিস্টান পরিবারের জরিপ করেছে। গোল্লা, হাসনাবাদ, তুইতাল ও শুলপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত, সিস্টার, ব্রাদার এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা ও উৎসাহে বিগত ১৮ নভেম্বর, ২০০০ খ্রিস্টাব্দে গোল্লা ধর্মপল্লীস্থ শহীদ ফাদার ইভান্স স্মৃতি মিলনায়তনে এ জরিপ কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন করা হয় চার ধর্মপল্লী থেকে ৬ জন জরীপকর্মী নিয়োগের মাধমে। এই জরীপ কাজকে পূর্ণতাদানের জন্য ছুটে যাওয়া হয় দোহারের নাগেরকান্দা গ্রামে যেখানে সমস্ত আর্থ-সামাজিক প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে আজও এক দুঃসাহসী খ্রিস্টান মেয়ে নিজের স্বধর্মবিশ্বাসকে বজায় রেখে বসবাস করছে। তার নাম মার্গারেট গোমেজ।

মার্গারেটের কথা আমাদের সমাজ একদম ভুলে গিয়েছিল। তার সাথে কথা বলে আঠারগ্রাম ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের (এডিসি) উদ্যোক্তা ও কর্মী ভাই-বোনদের কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও উৎসাহ আরো বৃদ্ধি পায় এবং আরও জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আর তা পূরণের জন্য পরিবর্তী লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় মেঘলা-মালিকান্দা পরিদর্শন।

নারকেল, সুপারি গাছ পরিবেষ্টিত ছায়াঢাকা এই স্কুল চত্বরের পরিবেশ সহজেই নবীন পথিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে প্রাচীন ইতিহাসের দিকে। বিস্মৃত ঠিকানার সন্ধান পাওয়ার বিষয়টি স্বাভাবিক আলোচনায় উঠে আসে কেউ বলেন, সেখানে যেতে হবে এখনই, আর দেরি নয়, আমাদের শিকড়ের সন্ধান আমাদেরই করতে হবে। প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় আমাদের পূর্বপুরুষদের এই কবরস্থানে প্রাথমিক ভাবে খ্রিস্টের চিহ্ন স্বরূপ অন্তত একটি ক্রুশ স্থাপন করতে হবে।

৫ জুন, মঙ্গলবার, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ। মুষলধারা বৃষ্টি মাথায় করে একদল লোক ঢাকা থেকে এবং অন্য দল গোল্লা, হাসনাবাদ ও তুইতাল থেকে পূর্ব নির্ধারিত মেঘলা মালিকান্দা স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে মিলিত হল। এ অভিযাত্রায় আঠারগ্রাম ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের কর্ণধার ড. ইসিদোর গোমেজ, স্থানীয় সমন্বয়কারী সিস্টার মার্গারেট গোমেজ জঘউগ, অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং জরীপ কর্মীদের সঙ্গে শরিক হলেন শ্রদ্ধেয় বিশপ লিনুস গোমেজ SJ, ফাদার আলফ্রেড গোমেজ, মি. জোসেফ গোমেজ, ইউপি সদস্য, মি. টমাস রোজারিও এবং মি. আলবিন দেসা সহ মোট ১৮ জন। সবাই একত্রিত হয়ে পা বাড়ালাম কবরস্থানের দিকে। কবরস্থানের নিকটতম প্রতিবেশিদের বাড়িতে গিয়ে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলে তারা আন্তরিকতার সহিত আমাদের ইচ্ছাকে স্বাগত জানায়। এতে আমাদের সকল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর হয়ে যায়। বাড়ির অনেক পুরুষ-মহিলা এবং আশপাশ থেকেও কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি আমাদের সাথে উপস্থিত হন। কেউ কেউ অনুযোগের সুরে বলেন, আপনারা এতকাল আসেন নাই কেন? তারা বলেন, পূর্বপুরুষদের কবর এভাবে অবহেলা, অবজ্ঞায় ফেলে রাখা ঠিক না। এখন থেকে আপনারা নিয়মিত এখানে আসবেন এবং কবরস্থানটিকে প্রাচীর দিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। বৃষ্টির মাঝেই ময়লা আবর্জনা সরিয়ে স্থানটি পরিস্কার করে ওখানে ক্রুশটি স্থাপন করা হলো। বিশপ লিনুস প্রার্থনা ও পবিত্র জল সিঞ্চন করে কবর আশীর্বাদ করলে এক ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে গেয়ে উঠল, "অনন্ত বিশ্রাম দাও প্রভু তাদের"। কবরে অনেকগুলো মোমবাতি জ্বালানো রইলো।

এবার বিদায় নেবার পালা। উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আবার আসব কথা দিয়ে আমরা রওনা হলাম। এভাবেই পূর্ণ হলো অনেক দিনের লালিত ইচ্ছা এবং সূচিত হলো শিকড় সন্ধানের প্রথম পর্ব।

নভেম্বর ২, ২০০২, পরলোকগণ খ্রিস্টভক্তের স্মরণ দিবসে দোহার উপজেলার অন্তর্গত মালিকান্দা গ্রামে অবস্থিত খ্রিস্টান কবরস্থানে প্রদীপ প্রজ্বলন ও ধুপারতির মাধ্যমে কবরস্থান আশীর্বাদ ও প্রার্থনা করা হয়। প্রয়াত ফাদার বকুল এস রোজারিও প্রার্থনা ও আশীর্বাদ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, সাথে ছিলেন ফাদার আলবার্ট টমাস রোজারিও এবং ফাদার জয়ন্ত এস, গোমেজ। শ্রদ্ধেয় ফাদার আবেল বি রোজারিও ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ নভেম্বর মালিকান্দা সংলগ্ন সুতারপাড়া গ্রামে নানার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে বাড়ি এখনও আছে এবং সেখানে মুসলমানরা বাস করে। ফাদার আবেল সেই বাড়িতে গিয়েছিলেন। বাড়ির লোকজন ফাদারকে অনেক সমাদর করেছিলেন। মালিকান্দার এই কবরস্থানে ফাদার আবেলের নানা ও মামা চির নিদ্রায় শায়িত আছেন।

পদ্মা নদীতে দোহারের চর এলাকায় অনেক চর জেগে উঠছে। কাগজপত্র ঘাটাঘাটি করে জানা গেছে, এই সব জমির মালিক খ্রিস্টান। দোহারের চর এলাকা থেকে প্রায়ই লোকজন গোল্লা, হাসনাবাদ, তুইতাল এবং শুলপুর যাচ্ছে জেগে উঠা জমির মালিকদের খোঁজে। এতো বৎসর পরে ওই সব লোকজন আর বেঁচে থাকার কথা নয়।

মালিকান্দায় খ্রিস্টান কবরস্থান

কবররের উত্তর-পূর্ব কোনায় ছোট্ট যে কবরটা দেখা যাচ্ছে, সেইটাই স্বর্গীয় আদু গমেজের।

নভেম্বর ১৮, ২০১৮ তারিখে এই কবরস্থানে ঢাকা, হাসনাবাদ, গোল্লা, তুইতাল এবং শোলপুর থেকে প্রায় ৫০০ লোক সেখানে চির নিদ্রায় শায়িত মানুষদের আত্মার কল্যাণে প্রার্থনা করার জন্য একত্রিত হয়েছিলো। শ্রদ্ধেয় বিশপ এঃবৎড়ঃহঁং এড়সবং ঈঝঈ পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। সাথে ছিলেন ফাদার আবেল রোজারিও, হাসনাবাদের পালক পুরোহিত সহ আরও পাঁচজন পুরোহিত।

সূত্র

১. ব্যান্ডেল গির্জার ইতিহাস
২. আঠারগ্রাম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার
৩. আঠারগ্রাম কল্যান সামিতি॥

বিয়ের অনুষ্ঠানে আতিশয্য আর নয়

রক রোনাল্ড রোজারিও

সময়কাল ডিসেম্বর, ২০২০। গোটা বিশ্ব তখন করোনা ভাইরাস নামক এক পরাক্রমশালী অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণে জেরবার। গাজীপুর জেলার ভাওয়াল অঞ্চলে খ্রিস্টান এক যুগল বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো করোনা মহামারী সংক্রান্ত সরকারি বিধিমালা মেনে। গির্জায় বিয়ে আশীর্বাদ এবং বরের বাড়িতে সামাজিক অনুষ্ঠানে বর ও কনে পক্ষের মাত্র দশজন করে আত্মীয়-স্বজন অংশগ্রহণ করে। সন্ধ্যা নামার আগেই গোটা অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

করোনা মহামারীকালে এমন অনেক সংক্ষিপ্ত ও অনাড়ম্বর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাধারণ অবস্থায় এমন বিয়ে একপ্রকার অকল্পনীয় বটে।

ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়া দেশগুলোতে বিয়ে মানেই হলো সপ্তাহজুড়ে নানা অনুষ্ঠানের অপ্রয়োজনীয় আতিশয্য। এসব অনাবশ্যক বাগাড়ম্বরের সাথে দেশীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির কোন মিল নেই বললেই চলে।

এহেন জৌলুসপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার উল্টোপিঠে আমরা দেখতে পাই দক্ষিণ এশিয়ার আর্থ-সামাজিক দূরাবস্থা যেখানে বিশ্বের মোট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তিন ভাগের এক ভাগ বাস করে যাদের মাথাপিছু দৈনিক আয় দুই মার্কিন ডলারেরও নিচে।

ভারতীয় অত্যন্ত ধনী ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিরা বিলাসবহুল বিয়ের অনুষ্ঠানকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যে বর্তমানে "বিগ ফ্যাট ইন্ডিয়ান ওয়েডিং" কথাটি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে।

২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সবচেয়ে ধনী শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি তার মেয়ে ইশা আম্বানির বিয়েতে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করে এ যাবত কালের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

বিলাসবহুল এহেন বিয়ের নজির পাকিস্তানেও রয়েছে। গবেষক আমিনা মহসিনের ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে লিখেছেন যে সে দেশে রেওয়াজ (ঐতিহ্য) রক্ষার নামে বিয়ের নানা পর্বের অনুষ্ঠানে ৭০ লক্ষ রুপি (৪২,০০০ মার্কিন ডলার) পর্যন্ত খরচ হয়ে থাকে।

বাংলাদেশেও একইভাবে সাম্প্রতিক সময়ে বিলাসী বিয়ের ধারা চালু হয়েছে। এর মানে নয় যে মানুষ এখন তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি নিয়ে অধিক সচেতন এবং এসব সামাজিক রীতি-নীতিকে নিষ্ঠা সহকারে পালন করতে ইচ্ছুক। মোদ্দাকথা হলো, লোক দেখানো বিলাসী বিয়ের অসুস্থ প্রতিযোগিতায় শামিল হওয়াটা অনেকটা হাল ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশে বিয়ের অনুষ্ঠানে বাড়ি দেখা, এনগেজমেন্ট, বিয়ে, বৌভাত এবং বিবাহোত্তর সম্বর্ধনাসহ কমপক্ষে চার-পাঁচটি ধাপ থাকে। এত সব পালন করতে গিয়ে বর ও কনের পরিবারকে সামাজিকতা রক্ষার নামে কম করে হলেও তিন থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করতে হয়। পরিবার যদি বিত্তশালী হয় তবে ব্যয়ের মাত্রা পাঁচ গুণের বেশিও হতে পারে।

২০১৭ খ্রিস্টাব্দে এক ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ তার একমাত্র ছেলের বিয়েতে চার হাজারের বেশি লোককে দাওয়াত করে পত্রিকায় খবরের শিরোনাম হয়েছিলেন। খবরে প্রকাশ যে তিনি বিরাট আয়োজন করে তার এলাকার মানুষের কাছে তার ছেলের বিয়ের ঘটনা চিরস্মরণীয় করে রাখতে চেয়েছিলেন।

"আবেগের বিনিয়োগ" গুরুত্বপূর্ণ

এশিয়া মহাদেশের কাথলিক সংখ্যাগরিষ্ঠ ফিলিপাইন এবং পূর্ব তিমুর ছাড়া আর সর্বত্রই খ্রিস্টানরা ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। কিন্তু তারাও ব্যয়বহুল বিয়ের গড্ডালিকা প্রবাহের বাইরে নয়।

আইমানি ফিলিপিন্সের তথ্য অনুসারে ফিলিপাইনে বিয়ের গড় ব্যয় ১১৩,১২০-৪৪৩,১৫০ পেসো (২,২৫০-৮,৮৪০ মার্কিন ডলার। এ ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে চার্চের বিয়ের লাইসেন্স এবং বিভিন্ন ডকুমেন্ট যার মূল্য ৩,১৫০ পেসো এবং চার্চে বিয়ের ফি যার খরচ ৭,০০০-২৫,০০০ পেসো।

ফিলিপাইনের মতো খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে যেখানে মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৭ ভাগ দরিদ্রসীমার নিচে বাস করে, সেখানে এমন ব্যয়বহুল বিয়ের রীতি একাধারে অখ্রিস্টীয় এবং পরিহাসমূলক। এহেন পরিস্থিতিতে অনেক দরিদ্র মানুষ চার্চে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না। এমন দরিদ্র বিরোধী এবং অগ্রহণযোগ্য নীতি খুবই হতাশাজনক।

একেকটি বিয়ে জীবন, ভালোবাসা এবং অফুরান সম্ভাবনার উৎসব হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু এশিয়ার ক্রমবর্ধমান পুঁজিবাদী এবং প্রতিযোগিতামূলক সমাজ ব্যবস্থায় তা ক্রমশই বিত্তের জৌলুস এবং তথাকথিত ইমেজ তৈরির উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজকাল বিবাহিত যুগলের দাম্পত্য জীবন যাতে সুখী এবং সফল হয় সেজন্য যেরূপ "আবেগের বিনিয়োগ" করা প্রয়োজন তার ততটুকু করা হয় সেটি নিঃসন্দেহে প্রশ্নবিদ্ধ। বর্তমানে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ক্রমবর্ধমান দাম্পত্য কলহ, বিচ্ছেদ এবং পারিবারিক ভাঙ্গনের দিকে তাকালে আমরা একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, বিয়ে অনুষ্ঠানের চাকচিক্যের ফুলঝুড়ি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সময়, অর্থ এবং শক্তি অপচয় ব্যতীত কিছুই নয়।

পারিবারিক সম্মান ও মর্যাদার নামে বিয়েতে এককালীন দামী পোশাক, স্বর্ণালংকার, দামী প্রসাধনী, বিলাসী খাদ্য, পানীয় ও মদ, ছবি, ভিডিও এবং আধুনিক সংগীত ও নৃত্য আয়োজনের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা এক প্রকার নিয়মে পরিণত হয়েছে। বিয়েকে একটি রুপকথার আয়োজনে পরিণত করার উদ্দেশ্য থেকে বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি ডলার মূল্যমানের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট শিল্প গড়ে ওঠেছে।

২০১৯ খ্রিস্টাব্দের এক সংবাদ প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ইংল্যান্ডের অভিবাসী বাংলাদেশিরা বিয়েতে গড়ে ৩৭,৩৫২ মার্কিন ডলার খরচ করে থাকে। কিন্তু তাদের মধ্যেই বিবাহ বিচ্ছেদের হার সবচেয়ে বেশি।

প্রায়ই বিলাসবহুল বিয়ের পক্ষে যুক্তি হিসেবে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির দোহাই দেয়া হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর মূল কারণ হলো অর্থহীন জৌলুসের নগ্ন প্রদর্শন এবং তথাকথিত আত্মতুষ্টি।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে প্রায়ই দেখা যায় মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো তাদের ছেলে ও মেয়ের বিয়ের জন্য বছরের পর বছর ধরে অর্থ জমা করে, অথবা ব্যাংক ও সমবায় সমিতিসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে। ঋণের জালে জর্জরিত হওয়ার যন্ত্রণা অনেক পরিবারকে বছরের পর বছর সহ্য করতে হয় এবং অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বহু নজির রয়েছে।

২য় ভাটিকান মহাসভার শিক্ষা অনুসারে কাথলিক মণ্ডলী স্থানীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে এবং এ কারণে বিয়ে সামাজিক রীতি-নীতিতে তেমন একটা হস্তক্ষেপ করে না, এমনকি বিয়ে পারিবারিক ব্যয়ে বিষয়েও খুব বেশি নজর দেয় না।

তবে প্রায় এক দশক আগে বাংলাদেশের কয়েকটি কাথলিক ডায়োসিস বিয়ে সংক্রান্ত

বিধিমালা জারি করে এবং বিধি-নিষেধ অমান্য করলে জরিমানার বিধান চালু করে। ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে বিষয়টি নিয়ে অনেকে আপত্তি তোলে, কিন্তু তা ধোপে টেকে নি। এ বিধিমালা চালুর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল বিয়ের অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত হৈ-হুল্লোড় এবং মদ্যপানের ফলে সৃষ্ট ঝগড়া-বিবাদ বন্ধ করা। কিন্তু প্রত্যাশার বিপরীতে প্রাপ্তি যৎসামান্যই। দেদারসে মদ্যপান, মাতলামি এবং ঝগড়া-বিবাদ গ্রামাঞ্চলের খ্রিস্টান বিয়ের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সম্প্রতি একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গে আলাপকালে তিনি এক বিয়ে বাড়িতে মদের পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয়ের কথা তুলে ধরে বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "মদ পরিবেশনে যে পরিমাণ ব্যয় হয়েছে তাতে একটা গরিব পরিবার সারা বছর চলতে পারতো।"

এশিয়ার বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থায় বিবাহের এহেন রীতি-নীতি পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করতে চার্চের তেমন কিছু করার নেই, আর তাই খুব বেশি প্রত্যাশা করাও উচিত নয়। কারণ একমাত্র ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া ও পূর্ব তিমুর ব্যতীত সর্বত্রই খ্রিস্টানরা সংখ্যালঘু। কিন্তু তা সত্ত্বেও চার্চ অন্তত কাথ লিক খ্রিস্টানদের বিলাসী বিয়ে থেকে বিরত রাখতে একটি সর্বজনীন নীতিমালা গ্রহণ করতে পারে।

কিভাবে এ চলমান বিয়ের নামে আতিশয্য পরিহার করা যায় এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার জন্য এবং তাদের মন-মানসিকতার পরিবর্তনে চার্চের নেতৃবৃন্দকে গভীরভাবে ভাবতে হবে। কাথলিক প্যারিশ এবং চার্চভিত্তিক সংগঠনগুলোকে এক্ষেত্রে কাজে লাগাতে যেতে পারে। বিয়েতে বিলাসীতা পরিহারের বিষয়টি কাথলিক বিবাহ প্রস্তুতির ক্লাসে যুক্ত করা উচিত। খ্রিস্টানরা যদি বিয়ে মাধ্যমে তাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে চায়, তবে সেটা তারা করুক অর্থ জমিয়ে গরীবদের দান করার মাধ্যমে।

বহু যুগ ধরে যে বিবাহ রীতি চালু রয়েছে, তার পরিবর্তন করা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু চার্চ এবং খ্রিস্টান সমাজকে সেটা নিয়ে ভাবতে হবে এবং প্রচেষ্টা চালাতে হবে। করোনা মহামারী আমাদের বাধ্য করেছে এমন অনেক কিছু করতে যা আমরা কোনদিন কল্পনাও করিনি এবং এমন কিছু গ্রহণ করতে যা কোনদিন গ্রহণ করার মতো মনে হয় নি।

আমরা যদি চাই তবে করোনা মহামারী আমাদেরকে জাঁকজমকের পরিবর্তে সাধারণ কিন্তু প্রীতিপূর্ণ বিয়েকে গ্রহণ করতে শিক্ষা দিতে পারে॥

ব্যতিক্রমী রান্না

ধুমকেতু

ছবি: শুভ পাস্কাল পেরেরা

আমাদের দেশে বহু আগে থেকেই "গণতন্ত্র" প্রস্তুত করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজনীয় উপকরণ কিংবা সঠিক প্রস্তুতপ্রণালী জানা না থাকার কারণে পুরোপুরি সফলতা আসেনি। সকলের সুবিধার্থে নিম্নে "গণতন্ত্র" প্রস্তুতপ্রণালী বর্ণনা করা হলো।

প্রধান সামগ্রী: একটি উন্নত মানের হাঁড়ি। বাজারে অনেক রকম হাঁড়ি পাওয়া যায় তন্মধ্যে "খোলামন কোম্পানীর" তৈরি হাঁড়িই ভাল। প্রথমে হাঁড়িকে "শপথ মার্ক" সাবান দিয়ে ঘষে মেজে "উদার" করে নিতে হবে যাতে "সন্দেহের" মত কোন কালো দাগ না থাকে।

উপকরণ: নির্বাচন ২ কিলোগ্রাম, ঐক্য ২ কিলোগ্রাম, নিরপেক্ষতা ১ কিলোগ্রাম, সঠিক সিদ্ধান্ত ৫০০ গ্রাম, আন্তরিকতা ৩০০ গ্রাম, সততা ১৫০ গ্রাম, সদিচ্ছা বাটা ১ টেবিল চামচ, সৌহার্দ্য বাটা ১ টেবিল চামচ, দায়িত্ববোধের গুঁড়া ২ টেবিল চামচ, আদর্শের গুঁড়া ২ টেবিল চামচ, শৃঙ্খলার গুঁড়া ২ টেবিল চামচ, সতর্কতার গুঁড়া ২ চা চামচ, সচেতনতার গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, অতীত ইতিহাস ২ টেবিল চামচ, "সংহতি" পরিমান মত, "এক কেন্দ্রিক দিক নির্দেশনা" বড় ১ বোতল, শান্তির বেরেন্সা ১ কাপ এবং সংগ্রাম ৫ কিলোগ্রাম।

প্রণালী: প্রথমে "নির্বাচনকে ধুয়ে "নিরপেক্ষতা" মাখিয়ে আধ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন। পুনরায় নির্বাচনকে ভাল করে ধুয়ে যাবতীয় "পক্ষপাতীত্ব" ঝরিয়ে ফেলুন। সঠিক সিদ্ধান্তগুলোকে আন্তরিকতা দিয়ে ভেজে তুলুন। মনে রাখবেন "সিদ্ধান্ত" বাস্তব রং ধারণ না করা পর্যন্ত নেড়েচেড়ে ভাজতে হবে। সদিচ্ছা বা সৌহার্দ্য বাটা, দায়িত্ববোধের গুঁড়া, আদর্শের গুঁড়া, শৃঙ্খলার গুঁড়া, সতর্কতার গুঁড়া এবং সচেতনার গুঁড়া নির্বাচনের সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে নিন। "অতীত ইতিহাস" আস্তে আস্তে সবটুকু ঢেলে দিন, এরপর "সততা" ভাজা এবং পরিমানমত "সংহতি"। এখন "ঐক্যকে" "সদিচ্ছা" দ্বারা ধুয়ে জটিলতা ছাড়িয়ে ৩ কাপ পরিমাণ ফুটানো "নিরপেক্ষতার" মধ্যে এক কেন্দ্রিক দিকনির্দেশনা মিশিয়ে পানি ঝরতে দিন। "ঐক্য" থেকে "নেতৃত্বের" ভাগাভাগি করে এর পানি ঝরা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত "সংকীর্ণতা" ঝেড়ে ফেলা আবশ্যক। এবার "নির্বাচনের" উপর "ঐক্য" ছড়িয়ে দিন। "ঐক্যের" সাথে "সংহতি" মিশিয়ে উনুনে চাপিয়ে সাবধানে নাড়তে থাকুন। লক্ষ্য রাখবেন যাতে "ঐক্য" এবং "সংহতি" গায়ে গায়ে মাখা মাখা থাকে। "নির্বাচন" থেকে "ঐক্য" এবং "সংহতি" আলাদা হয়ে গেলে "গণতন্ত্রের" স্বাদ অনেকটা কমে যাবে। নির্বাচন "ঐক্য" এবং "সংহতি" মিশে গেলে উনুন থেকে হাঁড়ি নামিয়ে ফেলুন এবং "জনতার সংগ্রামী আগুন" দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে দমে রাখুন। সব শেষে শঅন্তির বেরেন্তা ছিটিয়ে দিতে ভুলবেন না। এখন প্রস্তুতকৃত "গণতন্ত্র", "অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির" সালাদ সহ পরিবেশনের ব্যবস্থঅ করলে অধিকতর সুস্বাদু লাগবে। আশা করি উপরোক্ত নিয়মে "গণতন্ত্র" প্রস্তুতপ্রণালী অনেকের উপকারে আসবে॥

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি অম্লান হয়ে থাক

ফেলিক্স আশাক্রা

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশের মানুষ আজ সংগঠিত। মুক্তিযুদ্ধ না হলে হানাদার বাহিনীকে অতীত অল্প সময়ের মধ্যে হটিয়ে দেয়া সম্ভব হত না। দীর্ঘ সময় নয়; মাত্র ৯ মাস যুদ্ধ করে বাংলার মানুষ দেশকে স্বাধীন করেছে। পৃথিবীর বুকে এমন একটি নজীর বিহীন ইতিহাস বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছে। দেশকে ভালবেসেই, আপামর জনতা গেরিলা যুদ্ধ করেছে। তাদের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছে। এই ছিলো স্বাধীনতার প্রাক্কালে কঠিন বাস্তবতা এবং এই বাস্তবতাই ছিলো, স্বাধীনতা যুদ্ধের "মূল উৎস"। মুক্তি যুদ্ধের সূচনালগ্নে আত্ম প্রত্যয়ী হয়েই যুবাদের সংগঠিত করেছি। যুদ্ধ, সম্মুখযুদ্ধ প্রতিরোধ বুহ্য তৈরি সহ শরণার্থীদের সেবামূলক বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত হতে পেরেছি। তাই আনন্দ চিত্তে এবং গৌরবের সাথে আজ এ দেশের ৫১তম বিজয় দিবসে 'মুক্তিযুদ্ধের' স্মৃতি অম্লান থাকুক, আমার এ লেখায় স্মৃতিচারণ করছি।

৭ মার্চ, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ উত্তাল হয়ে পড়ে সাড়াদেশ জুড়ে। মুক্তিকামী মানুষ, পাক হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে শতভাগ প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে যায়। আমাদের ইউনিয়নের ১৫টি স্থানে প্রতিদিন ভোরে লাঠি-সোটা নিয়ে সামরিক মহড়া শুরু করি। আমাদের কমান্ড করতেন প্রয়াত চিত্তরঞ্জন আরেং এবং সন্তোষ বিশ্বাস। যিনি ২৪ জুলাই বিজয়পুরে সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হন।

ইতিমধ্যে পাকবাহিনী, রাজাকার, আলবদর, আলসামস অর্থাৎ হানাদার বাহিনীর দোসররা সুসঙ্গ রাজবাড়ী ও হাইস্কুল মাঠে শক্ত ঘাটি করে সীমান্ত এলাকায় অগ্রসর হতে থাকে। আতঙ্কিত মানুষ নিজেরাই সীমান্ত পার হয়ে মেঘালয় রাজ্যে প্রবেশ করে। বাঘ মারা শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। আমরা সংগ্রাম কমিটির সদস্যদের নিয়ে বাঘমারা ইউথক্যাম্পে চলে যাই। সেখানে ক্যাপটেন মোড়ারী এবং তৎকালীন ইপিআর, সুবেদার মেজর আতিকুর রহমান (আতিক) তাদের কাছে রেজিষ্ট্রেশন করি। ইতিমধ্যেই ইয়ুথ ক্যাম্পে রেজিষ্ট্রার ভুক্ত ১৩২ জনকে তাৎক্ষণিক ভাবে "গেরিলা" প্রশিক্ষণের জন্য মেঘালয়ের রংনাবাক নামক স্থানে পাঠাই। আমাদের ১০ জনকে যুবাদের সঙ্গে ঠিক করার কাজে ইয়ুথ ক্যাম্পেই রেখে দেয়। আমরা শরণার্থী শিবিরে ঘুরে ঘুরে যুবাদের সংগঠিত করে ইয়ুদক্যাম্পে নিয়ে আসার কাজ শুরু করি। পাশাপাশি শরণার্থীর রেজিষ্ট্রেশনসহ বিভিন্ন সেবামূলক কাজও করতে থাকি।

২৩ জুন, ক্যাপটেন মোড়ারী বললেন, "আমাদের কাছে তথ্য এসেছে যে, রাণীখং মিশন ও এলনবাড়ী ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিসে পাক বাহিনী শক্ত ঘাঁটি করে ইয়ুথক্যাম্প, বিএসএফ ক্যাম্প ও শরণার্থী শিবিরকে তাদের ফায়ারিং রেঞ্জের আওতায় এনে আক্রমনের প্রস্তুতি নিয়ে আছে। তর্কীতে তাদের উপর হামলাম করতে হবে। আমরা সন্ধ্যা হতেই তিন কিলোমিটার জায়গা জুড়ে ১২০টি ট্রেঞ্চ ও বাঙ্কার তৈরি করে ফেলি। অনদিকে সিআরপি (সেন্ট্রাল রিজার্ভ ফোর্স) ঐ রাতেই বাঘমারার সর্বোচ্চ পাহাড় দিলশাহাবিরীর ফাঁকা ময়দান জায়গায় ভারি গোলাবারুদ নিয়ে শত্রু মোকাবিলার সকল প্রস্তুতি নিয়ে কাভারিং এর জন্য প্রস্তুতি নেয়।

২৪ জুন। সকাল ৭টায় ১২০টি ট্রেঞ্চ ও বাঙ্কারে উৎ পেতে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য হালকা সবুজ রং এর লতাপাতায় মোড়ানো একটি গাড়ী নাস্তা, পানি ও গোলাবারুদ পৌঁছে দিয়ে যায়। এখন শুধু পিছনের দিলমাহাবিরীর সিআরপির কাভারিং ইউনিট থেকে একটি মাত্র ফায়ারিং সিগন্যালের অপেক্ষায় মুক্তিযোদ্ধারা নিজ নিজ অবস্থানে রয়েছে। বলে রাখা প্রয়োজন, দেড় কিলোমিটারের ব্যবধানে পাঞ্জাবীদের আস্তানাও ছিলো ছোট ছোট পাহাড়ও টিলায় ঘেরা। রাণীখং মিশন বিজয়পুর ইপিআর ক্যাম্পে ছিলো উচু পাহাড়ী টিলায়। বিবদমান দুই দলের মাঝে অবস্থান ছিল প্রস্তুত সমতল ধান ক্ষেত। মুক্তি বাহিনীদের পজিশন ছিলো মেঘায় রাজ্যের পাহাড়ী টিলায়। দেড় কিলোমিটার ব্যবধানে এই রণক্ষেত্র। বর্ষাকাল হলেও, সেদিন ছিল আকশ পরিষ্কার ও রৌদ্রজ্জ্বল। সকাল ৯টায় পিছনের দিলামা হাবিবির হতে কাভারিং ইউনিট হতে রকেট মটারের মাধ্যমে ফায়ারিং কমান্ড পোষ্ট করা হলে, সাথে সাথে মুক্তিযোদ্ধারা খুব কাছে থেকেই হানাদার বাহিনীর অবস্থানের উপর গোলা বর্ষণ শুরু করে। পাক বাহিনীও পাল্টা জবাব দিতে থাকে। পিছন হতেও কাভারিং ইউনিট ভারী ও হালকা রকেট মর্টার দ্বারা আঘাত হানতে শুরু করে।

পাক বাহিনী খুব সুকৌশলে তিন দিক হতে পাল্টা আঘাত শুরু করে। তারা প্রথম হতেই মুক্তিবাহিনীদের মেশিন গানের অবস্থান লক্ষ্য করে আঘাত করতে থাকে। দুপুরের দিকে তাদের ছোড়া একটি রকেট মর্টার বাঘমারা মিশনের বয়েজ হোস্টেলের উপর গিয়ে পড়লে, তা প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হয় এবং আগুন লেগে যায়। তাতে মিশনের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। কিছুক্ষণ পড়েই তাদের আরেকটি মর্টার মুক্তিযোদ্ধাদের বাঙ্কারে পড়লে তা ঘুরিয়ে যায়। কিন্তু কেউ হতাহত হয়নি। তারপরই মুক্তিযোদ্ধারা সুনিপুণ কৌশলে স্থান পরিবর্তন করে হালকা মেশিন গান দিয়ে গোলা বর্ষণ শুরু করে।

প্রচণ্ড গুলাগুলির পর দুপুরে নাসাদ পাঞ্জাবীরা তাদের ঘাঁটি হতে পিছু হটটে শুরু করে। এ সময় পিছন হতে ভারী মেশিন গানের গোলাবর্ষণের মাধ্যমে তাদের কভার দিচ্ছিল। এমনি এক সময়ে আমরা ব্রাশ ফায়ার করতে জয় বাংলা বলে চিৎকার দিতেই হানাদার বাহিনীর একটি বুলেট তার মাথায় আঘাত করে। তার নিথর দেহটি মুহূর্তে মাটিতে পড়ে যায়। শোকের ছায়া নেমে পড়ে। ম্যাসেজ চলে যায় কাভারিং হাই কমান্ডে। বিকাল ৩টায় বাঘমারা স্থানীয় হাসপাতালে তার মার দেহের সুরতহাল সম্পন্ন হয় এবং সন্ধ্যা ৬টায় সোমেশ্বরীর তীরে যথাযোগ্য মর্যাদায় তাকে দাহ করা হয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধ দেখেছি। দেশ আজ মুক্ত। সম্প্রতি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীও পালন করেছি। কিন্তু দেশকে স্বাধীন করতে বলিপাড়ার সেই কুদুচাঁন বিশ্বাসকে হারাতে হয়েছে তার দু সন্তাকে। একজন সন্তোষ বিশ্বাস, যিনি বিজয়পুরের সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। আরেকজন রযময় বিশ্বাস, যিনি অপারেশনে গিয়ে মাইন বিস্ফোরনে পা হারান। পরে মারা যান। আজ স্বাধীনতার ৫১তম বিজয় দিবসে সেই শহীদদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। মুক্তিযুদ্ধের সকল ইতিহাস ও স্মৃতি অমর ও অম্লান হয়ে থাকুক॥

একজন মুক্তিযোদ্ধার স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম বড়দিন

আব্রাহাম অরুন ডি কস্তা

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনাতা যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য ভারতের আগরতলা পালাটনা ট্রেনিং সেন্টারে সামরিক অস্ত্র ও এ্যাকস্প্লসিভ/ডেমোলেশনের উপর দেড় মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর বাংলাদেশে চলে আসি। দেশে এসে প্রথম ছোটখাটো কিছু অপারেশন করার পর ডিসেম্বর ১০-১১ তারিখে মিত্র বাহিনীর সঙ্গে মিলিয়া পূবাইল পাক বহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। এই যুদ্ধ দুই দিন চলার পর পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। এটাই ছিল অত্র এলাকায় শেষ সম্মুখ যুদ্ধ। এরপর ডিসেম্বর ১৬ তারিখে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে ইস্টার্ন জোনের কমান্ডার জেনারেল নিয়াজির ৯৩ হাজার পাক সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়ে অর্জিত হল বাংলাদেশের বিজয়/স্বাধীনতা। স্বাধীনতার পরপরই নিজ এলাকার শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার জন্য আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হল। তখন থানার কার্যক্রম পূনর্গঠিত করতে কয়েক মাস সময় লাগে। এই সময়ে প্রশাসনটি কিছু কার্যক্রমের দায়িত্ব আমাকে নিতে হয়েছিল। এরই মধ্যে এসে গেল ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলা দেশে বিভিন্ন এলাকায় পাকিস্তানি সেনারা ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল। আমাদের এলাকায় বিশেষ করে রাঙ্গামাটিয়া গ্রাম পাক সেনারা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং বেশ কিছু লোকও মেরেছিল। অত্র এলাকার সবার মুখেই ছিল স্বজন/প্রতিবেশি হারানোর বেদনার ছাপ। কারও মনেই ছিল না বড়দিনের আমেজ ও আনন্দ ফুর্তি। তখন রাঙ্গামাটিয়া গ্রামটি দেখলে মনে হত যেন একটি শশ্মান খোলা। দেখলে গা শিহরিয়া উঠত। ভারাক্রান্ত মনে দিন কয়টি শুধু পারই করেছিলাম কিন্তু মনে ছিলনা কোন আনন্দ ফুর্তি। অনেকের জন্য ছিল তখন সুখের বড়দিনের পরিবর্তে দুঃখের বড়দিন॥

সম্পর্কের প্রগাঢ়তায় তুমি আমি

মিতালি মারীয়া কস্তা

আমার কাজিন বিয়ে করে নতুন সংসার শুরু করেছে। দু'জনের সংসার। একটা এ্যাপার্টমেন্টে একরুম নিয়ে সাবলেট থাকে দু'জন। আমাকে বাসার ঠিকানা দিয়ে বলল,

- তোমরা এসো আমাদের বাসায়। বাসায় এলে কলিং বেল বাজাবে না। আমাকে একটা মিসকল দিলেই আমি বুঝব। তখন আমি দরজা খুলে দেব।

- কেন কলিং বেল বাজালে সমস্যা কি?

- কার গেস্ট আমরা বুঝব কিভাবে। যার গেস্ট তাকেই দরজা খুলতে হবে। আমরা যাদের সাথে থাকি তাদের সাথে আমাদের এমনই কথা হয়েছে।

- একই বাসা, একজনের গেস্ট আসলে, অন্যজন দরজা খুলে দিলে সমস্যা কি!

- তারা ডিস্টার্ব পছন্দ করে না।

এই হচ্ছে আমাদের ঢাকা শহরের সম্প্রীতি। একই ছাদের নিচে থেকেও আমাদের পরস্পরের সম্পর্কের এই অবস্থা। অন্যদিকে উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামেও লেগেছে শহুরে হাওয়া। যেই গ্রামে আমরা মেয়েরা দলবেঁধে হেঁটে স্কুলে যেতাম সেইগ্রামে এখন আর কোন মেয়ে হেঁটে স্কুলে যায় না। কেন? গ্রামের রাস্তাঘাটও এখন আর নিরাপদ না। তাহলে আমাদের জীবনে সামাজিক ও পারস্পারিক সম্প্রীতিটা কোথায় আছে? আমরা যারা ঢাকা শহরে থাকি তারা নিরাপত্তার ভয়ে ছেলে-মেয়েদের এক ঘরে করে রাখি। উপরন্তু বইখাতার বোঝা চাপিয়ে তাদেরকে আমরা ভুল করে দিচ্ছি। প্রকৃতির মাঝে বেড়ে উঠলে যে মানসিক বিকাশ হয় তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে আধুনিক ছেলে-মেয়েরা। ফলে ওদের চাওয়া পাওয়া হয়ে যাচ্ছে প্রযুক্তি নির্ভর। খোলা আকাশের নিচে প্রাণভরে শ্বাস নেওয়ার জায়গাটুকু হয়ে যাচ্ছে সংকীর্ণ। গণ্ডিঘেরা ছেলে-মেয়েগুলো সামাজিক সম্প্রীতির অর্থ বা গুরুত্ব কোনটাই বুঝে না। সারা বিশ্বে প্রযুক্তি এগিয়ে যাচ্ছে ধাই ধাই করে কিন্তু অন্যদিকে ধীরে ধীরে দৃষ্টির অন্তরালে ক্ষয়ে যাচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ, পরস্পরের সম্পর্কের দৃঢ়তা। আমরা যদি দেখি পরিবার ও আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বন্ধন কতটা দৃঢ়, তা হলে দেখতে পাই সেখানেও সম্পর্কের ধারাটা নিম্নগামী। এখন আমরা পরস্পরের প্রতি সমস্ত দায়িত্ব, যোগাযোগ এমনকি নিমন্ত্রণটুকুও সেরে ফেলি ফোন কলের মাধ্যমে। ফোন ব্যবহারের অনেক সুবিধা আছে সত্যি। কিন্তু এই ফোনই আবার আমাদের অনেক সাবলীল সম্পর্ক, যোগাযোগগুলোকে সংকীর্ণ করে দিয়েছে। শহুরে জীবনে আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে কে থাকে আমরা তা-ও জানি না। অথচ আরো দুই দশক আগের চিত্রও এর থেকে ভিন্ন ছিল। প্রতিবেশির সাথে সম্পর্ক ছিল আরো গাঢ়। প্রতিবেশির উপর নির্ভর করে ছোট ছেলে-মেয়েদের একা বাসায় রেখে মা-বাবা বাইরে যেতেন নিশ্চিন্তে। কিন্তু এখন? এখনকার চিত্র একেবারেই উল্টো। এখন মা-বাবা আর প্রতিবেশির উপর নির্ভর করেন না। তারা নির্ভর করেন ইলেক্ট্রনিক্স ছোট একটা ডিভাইস, মুঠোফোনের উপর। প্রযুক্তি আমাদের এনে দিয়েছে উন্নয়নের জোয়ার, আবার এই প্রযুক্তিই মানুষের জীবনের সম্পর্কগুলোকে খণ্ড খণ্ড হয়ে যাওয়ার জন্য অনেকাংশেই দায়ী। আমাদের শৈশব কেটেছে গ্রামের পরিবেশে, সেই দিনগুলোতে ধর্মীয় উৎসব, বিয়ের উৎসব সবকিছুই ছিল সমাজ নির্ভর। বিয়ের যাবতীয় কর্মযজ্ঞ সমাধা করত সংঘবদ্ধ গ্রামের লোকেরা। বিয়েতে ব্যবহৃত থালা-বাসন, তৈজসপত্র সব ছিল সবার ব্যবহারের জন্য। আমাদের ধর্মীয় উৎসবকে ঘিরে বৈঠক বসত। সেই বৈঠকে সবাই যার যার বাড়ি থেকে পিঠা নিয়ে এসে একত্রে ভাগাভাগি করে খেত। এইসব উৎসবকে ঘিরে তৈরি হতো একটা নিগূঢ় সম্প্রীতি বা ভালোবাসার সম্পর্ক। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সেই সব উৎসবগুলোর ধরন পরিবর্তিত হয়ে গেছে, ফিকে হয়ে গেছে সামাজিক সম্পর্কের বাঁধন। পরিবারগুলোর আকৃতিও হয়ে যাচ্ছে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর। সবার মধ্যেই এক ধরনের স্বার্থপরতার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে এক সময় শাখা-প্রশাখা সমৃদ্ধ বিশাল বৃক্ষে পরিণত হচ্ছে। মানুষের মাঝে আত্মকেন্দ্রিকতা প্রকট হয়ে যাচ্ছে। সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে ভার্চুয়াল সম্পর্ক। একই ঘরে হয়ত মা-বাবা-সন্তান ব্যস্ত যার যার ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস নিয়ে। এক সময় মানুষের বিনোদনের বড় মাধ্যম ছিল বই পড়া। পরস্পরকে বই উপহার দেওয়া ছিল আমাদের ছাত্রজীবনের রেওয়াজ। কিন্তু এখন সেই আমরাই একটু অবসর পেলে ডুব মারি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে। এতে আমাদের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে আধুনিকতা, কিন্তু নব প্রজন্ম বেড়ে উঠছে প্রযুক্তিতে সম্পৃক্ত হয়ে। এরা বঞ্চিত হচ্ছে সম্পর্কের দৃঢ়তা থেকে। তাহলে এদের পরবর্তী প্রজন্মের অবস্থা কি হবে? ওরা কি অনুভব করবে ওদের শিকড়ের অস্তিত্ব?

পৃথিবীতে সম্পর্কের বন্ধন হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধন। এই বন্ধনকে দৃঢ়তর করে রাখতে পারে একমাত্র পারস্পারিক ভালোবাসা। ভালোবেসে একে অন্যের উপর নির্ভর করা, কাছাকাছি থাকা, একে অন্যের দুঃসময়ে পাশে থাকা এসবই আমাদের সামাজিক সম্পর্কের চাহিদা। অথচ আমরা এখন এমন একটা সময়ে বাস করছি যখন বাবা-মা হয়েও আমরা টের পাই না আমাদের সন্তানদের মানসিক অবস্থা। আজকাল অনেক টিন-এজার ছেলে-মেয়েরা বিষন্নতায় ভুগে। পাশে থেকেও আমরা অনুভব করতে পারি না আমাদের কাছের মানুষটি বা বন্ধুটি মানসিকভাবে কতটা যন্ত্রণায় ভুগছে। এই মানসিক লড়াইয়ে হেরে গিয়ে আমাদের কত প্রিয়জন অসময়ে হারিয়ে যায় আমাদের কাছ থেকে। অথচ ভালোবাসা এবং সম্পর্কের প্রগাঢ়তা থাকলে এসব সমস্যাগুলো তৈরি হয় না।

আমাদের বর্তমান প্রজন্ম শুধু যান্ত্রিকতায় নয় বেড়ে উঠুক মানবিকতায়ও। তারা যেন তাদের শিকড়ের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে সেই জন্য আমরা বড়রা পারস্পারিক ভালোবাসা তাদের সামনে প্রস্ফুটিত করি। সামাজিক সম্পর্ককে জিইয়ে রাখতে হলে বাড়াতে হবে সামাজিক কর্মকাণ্ড। বেরিয়ে আসতে হবে এককেন্দ্রিকতার বেড়াজাল থেকে। পৃথিবী আজ ভারাক্রান্ত, অসহায়, তার দায়ভারে ম্রিয়মাণ। চারিদিকে অশান্তি হানাহানির দামামা। মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে হৃদয় থেকে মানবিকতা। এ ঘোর অমানিশাকালে জাতির কাণ্ডারী হিসেবে হাল ধরবে এই নতুন প্রজন্ম। পঙ্কিলতাকে এড়িয়ে স্বচ্ছ সরোবরে একের পর এক পুষ্পিত হবে তাদের মানবিকতার কোমল ফুল। এই ফুলের সৌরভ সব কালিমাকে মোচন করে পৃথিবীকে করে তুলবে সুন্দর, পবিত্র, স্নিগ্ধ। আমরা মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রতিনিয়ত নিজেকে ভালো রাখার জন্য প্রার্থনা করি। পরের মঙ্গল কামনা করার মত উদার মানসিকতার বড় অভাব আমাদের মাঝে। কিন্তু, সময় আমাদের বার বার সতর্ক করে দিচ্ছে যে, আমরা যদি পরার্থে মঙ্গল কামনা না করি তাহলে এক সময় মানুষ হিসেবে আমরা আমাদের মনুষ্যত্বকে হারিয়ে ফেলব। তাই মনুষ্যত্ব অর্জনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে আমাদের সবাইকে। মানবিকতা হল আমাদের সর্বোত্তম গুণ। মানুষের গুণবিকাশই প্রকাশ করে মানুষের অস্তিত্ব। মনুষ্যত্বকে বড় করে দেখা এবং পরস্পরকে ভালোবেসে কল্যাণ চিন্তা করাটাই মানবমন্ত্রের মূলসুর হওয়া উচিত। শান্তি ভেতর থেকে আসে। বাইরে কোথাও এটি খুঁজতে হয় না। আমাদের এই অশান্ত বিশ্বকে শান্ত করতে হবে। দেশ আমাদের, দেশের মঙ্গল মানে আমাদের মঙ্গল। তাই সকলের কাম্য মানবতার জয় হোক। আর এই জন্যই রোহিঙ্গাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, সমগ্র বিশ্ব। আজ সময় এসেছে সবার পাশে সবার দাঁড়ানোর। আমাদের সকলেরই উচিত নিজেকে ভালোবাসা। এটা স্বার্থপরতা নয়। যে নিজেকে ভালোবাসে সে অপরের জন্য ভালোবেসে কিছু করতে পারে। আমরা যদি ভালোবেসে একজন আরেকজনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিই তাহলে হয়তো অনেকের জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণা কিছুটা হলেও লাঘব করতে পারি। অনেককেই হয়তো জীবনের আলোকিত পথে নিয়ে আসতে পারি। আমাদের প্রত্যেকের ক্ষণিক এই জীবনকাল যেন হাহাকারময় নয়, হয় যেন ভালোবাসাময়॥

সংসারে প্রয়োজন ভালোবাসার মাদকতা

বেনেডিক্ট মূর্মূ

একসাথে একই বিছানায় ঘুমালেই কিন্তু মানুষটার কাছে যাওয়া যায় না। দু'জন মানুষ ১০০ স্কয়ার ফিট একটা রুমের ভেতর বছরের পর বছর থেকেও মাঝে মাঝে কাছে আসতে পারে না। আমি এরকম বেশ কিছু দম্পতিকে চিনি, যারা বহু বছর পরও সংসারের মানে বুঝে উঠতে পারেনি। আবার কেউ কেউ বছরের পর বছর প্রেম করে বিয়ে করেও দুই মাসও তাদের বিবাহিত জীবন ধরে রাখতে না পেরে আলাদা হয়ে যায় এমনকি ডিভোর্সও হয়ে যায়।

সংসার করতে করতে এক সময় মানুষ ধরে নেয়, একই বালিশে ঘুমানো, একই টেবিলে খাওয়া, একই রুমে ঘুরাঘুরি, আর মাঝে মাঝে সঙ্গমে অংশগ্রহণ করাটাই সংসার। ব্যাপারটা কি আসলে তাই?

তাহলে, কিছু সংসার কখনো কখনো টিকে না কেন? তারাওতো একই বিছানায় ঘুমায়। একই টেবিলে খাবার খায়। একজন অন্যজনকে সঙ্গমে কো-অপারেট করে। তবুও সংসারগুলো ভাঙে কেন?

তুমি একটা মানুষ সাথে আছো, পাশে আছো, চোখের সামনে আছো। তবুও মাঝখানে একটা দূরত্ব থাকে। এই দূরত্বটা অন্যরকম। বলা যায় না, বুঝানো যায় না আবার সহ্যও করা যায় না। কারো বুকের উপর শুয়েও মাঝে মাঝে নিজেকে একা লাগে। দাম্পত্য জীবনে আমি আসলে কি চাই? সবই চাই, যা যা সবায় চায়, যেটা অনেকেই করে না।

সংসার মানে আসলে অভ্যাস। এই কনসেপ্টটা থেকে আমরা কেন জানি বের হতে পারি না। অভ্যাস অবশ্যই, তবুও সবই কি অভ্যাস? নতুন কিছুই কি থাকে না? আমরা একই ছাদের নিচে থাকি, অথচ কখনো একসাথে আকাশ দেখি না। কখনো সমুদ্র পাড়ে বসে কফির মগ হাতে নিয়ে নির্ভরশীলতার কাঁধে মাথা রাখি না। আমরা কখনো জিজ্ঞেস করি না "তুমি কেমন আছ? তোমার মন খারাপ কেন? আমরা হাত ধরে বসে থাকি না। আমরা সঙ্গম ছাড়া একজন অন্যজনকে জড়িয়ে ধরি না। আমরা বুঝি না, আমার সমস্ত সময় তার সাথে কাটানোর পরও আমার তাকে সময় দেয়া প্রয়োজন। আমরা শরীরের দিক থেকে কাছে আসি রোজ রোজ। অথচ, আমাদের মনের দুরত্ব বেড়ে চলে।

রান্না করার জন্য বুয়া রাখলেও হয়। সঙ্গমের জন্য পতিতাই এনাফ। তবুও সংসার কেন করা লাগে? সংসারের ডেফিনেশনটা শুধু নিঃশ্বাসের আর্দ্রতা অনুভব করার মাঝেই সীমাবদ্ধ না। এর বাইরেও অনেক কিছু

ছবি: পিটার ডেভিড পালমা

থাকে। আমি একা-তুমি একা-আমরা একা। প্রচণ্ড রকমের একা। একই বিছানায় নয় শরীরের উপরও একা। সঙ্গম শেষেও আমরা একা।

অথচ, দিন শেষে আমার একটা আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়। একজন মানুষ প্রয়োজন হয়। একটা ব্যক্তিগত নির্ভরশীলতার জায়গা প্রয়োজন হয়। সমঝোতা প্রয়োজন হয়। কারো কণ্ঠস্বরে আমার জন্য একটা গভীর ভালোবাসা প্রয়োজন হয়। একটা পবিত্র স্পর্শ প্রয়োজন হয়। এই স্পর্শটা কামনার স্পর্শ নয়। এটা একটা ভালোবাসার স্পর্শ। কাম ছাড়া ভালোবাসা পূর্ণতা পায়না এটা ঠিক। তবে কাম ও যে সবসময় ভালোবাসার জন্ম দিতে পারে না, এটাও ঠিক।

সংসারকে অভ্যাস বলে চালিয়ে যাওয়া দেওয়া মানুষেরা আসলে ভালোবাসার দায়বদ্ধতাকে এড়িয়ে যেতে চায়। যে দাম্পত্যে প্রেম থাকে না, সেখানে অভিনয় করে বাঁচতে হয়। এরকম অনেক দম্পতিই আছে, যারা শুধু অভিনয় করেই একটা জীবন, একটা অপছন্দের মানুষের সাথে একই ছাদের নিচে কাটিয়ে দেয়।

সারাদিন কাজ করে ঘরে ফিরে স্ত্রীকে সময় দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করা স্বামীও নিয়ম করে সঙ্গমটা ঠিকঠাক করে। ব্যস্ততা আসলে একটা অজুহাত। অতটা ব্যস্ত আসলে মানুষ থাকে না। চাইলেই একটু সময় বের করা যায়। আমি জানি আমরা হয়তো চাই-ই না।

যার সাথে সারাটা জীবন কাটাতে হবে, যার জন্য সারাদিন পরিশ্রম করি, যাকে ভাল রাখার চেষ্টা করি, মাঝে মাঝে বুঝিই না, সে ভালো নেই। দাম্পত্য জীবনে কলহ থাকবেই। এটাকে ইন্সটেন্ট সমাধান করার ক্ষমতা সবার থাকে না। ঝগড়া হওয়ার পর প্রচণ্ড মন খারাপ না করে মানুষটাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকলে কেমন হয়। মানুষকি এতটাই নিষ্ঠুর, যে ভালোবাসাকে অবহেলা করতে পারে?

সংসার শুধু একাট অভ্যাস, এটা থেকে বের হতে হবে। সংসার একটা স্বর্গ। এখানে শুধু সঙ্গম, দু'বেলা খাবার আর একই বিছানায় ঘুমানোর বাইরেও প্রেম, ভালোবাসা, নির্ভরশীলতা, গুরুত্ব, প্রায়োরিটি, শ্রদ্ধাবোধ, এডজাস্টমেন্ট সব প্রয়োজন হয়। সব মানে সব।

দাম্পত্য জীবন সুন্দর তখনই হয়, যখন আমরা অভ্যাস থেকে বের হতে পারি। মানুষটা একটা অস্তিত্ব হোক। অধিকার হোক। বেঁচে থাকার ডেফিনেশন হোক। একটা এডিকশন হোক। আমার সংসার হোক আমাদের নেশাগ্রস্থ থাকার অ্যালকোহল। আমাদের মাঝে ভালোবাসার মাদকতা থাকাটা জরুরী, ভীষণ জরুরী॥

বড়দিনের গির্জায় যাওয়ার পথে

শিশির আলেকজান্ডার কস্তা

ছবি: লিটন আরিন্দা

বড়দিনের আগের দিনটি ছিল শনিবার। সেদিনের কর্ম-ব্যস্ততার পরিমাণটা সাধারণত একটু বেশিই থাকে। সকাল পেরিয়ে পর্যাক্রমে আসলো দুপুর, সন্ধ্যা এবং রাত। রাতে বিছানায় ঘুমাতে গেলাম ঠিকই কিন্তু ঘুম একবারেই আসছিল না। কেমন যেন একটা অস্থির অস্থির ভাব। চোখটা যেন ঘুমের কথা ভুলেই গেছে। আবার জোর করে চোখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করলে, চোখ পিট পিট করতে থাকে। শুধু আমি একা নই, আমার স্ত্রী, মেয়ে তার ও দেখেছি বিছানায় শুয়ে না ঘুমিয়ে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম, কি ব্যাপার? ঘুমাচ্ছে না কেন? রাত তো অনেক হল। এবার ঘুমিয়ে পড় কারণ সকালে আবার তাড়াতাড়ি উঠতে হবে। তারা আমাকে বলল, তুমিও তো ঘুমাচ্ছ না। অবশ্য কথাটা ঠিকই যে, আমাদের কারো চোখে তখন ঘুম আসছিল না এই আনন্দে যে, পরের দিন অর্থাৎ বড়দিনের দিন সকালে নতুন পোশাক পড়ে পরিবারের সবাই মিলে এক সাথে গির্জায় যাব। সত্যি এই এক অপূর্ব আনন্দের বিশেষ মুহূর্ত। যেটা প্রায় সবার ক্ষেত্রেই কম-বেশি হয়ে থাকে। যাই হোক-

বড়দিরে দিন সকালে সবাই মিলে গির্জার দিকে রওনা হলাম। কিছু দূর এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল একটি ছালার বস্তা, রাস্তা থেকে ৫-৬ গজ দূরে একটা গাছের গোড়ায় রাখা আছে। প্রথমে ভাবলাম, হয়ত বস্তার মধ্যে কেউ গাছের শুকনো পাতা কুঁড়িয়ে ভরে রেখেছে। কিন্তু দ্বিতীয়বার সেই বস্তার উপর চোখ পড়তেই দেখলাম বস্তাটি এমনিতেই নড়ে উঠল। একটু অবাক হলাম। মনের মধ্যে সামান্য খটকা লাগল, কৌতুহলও জাগল। বস্তার মধ্যে কি আছে, আমাকে দেখতেই হবে। আমি আমার স্ত্রী ও মেয়েকে বললাম, তোমরা গির্জায় যেতে থাক, আমি একটু পরে আসছি।

আমিও আর দেরি না করে বস্তার দিকে এগুতে থাকলাম। যদিও একটু ভয় ভয় করছিল, তবুও আমাকে জানতেই হবে বিষয় কি? আস্তে আস্তে এগুচ্ছি ঠিক ঐ সময় গাছের উপর থেকে একটি লোক জোরে বলে উঠলো, সাবধান। ঐ দিকে যাবেন না। বস্তার ভিতরে একটি লোক আছে, লোকটি খুব খারাপ। আমি একটু চমকে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। কি করবো ভেবে উঠতে পারছিলাম না। ততক্ষণে লোকটি গাছ থেকে নেমে আমার সামনে এসে দাঁড়াল আর বলল, এখান থেকে আপনি চলে যান। বললাম তো লোকটিকে খুব খারাপ। আমি তার কোন কথার জবাব না দিয়ে দাঁড়িয়েই রইলাম। আমি এইভাবে দাঁড়িয়ে আছি দেখে আমাকে ধমকের স্বরে বলল, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? যান! তখন আমার মনে সন্দেহ জাগল আর মনে মনে ভাবতে লাগলাম, লোকটি আমার সাথে রাগ করে কথা বলছে কেন? নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে। তাই আমিও নিজের মনটাকে একটু শক্ত করে লোকটির বললাম, আপনি আমার সাথে এই ভাবে কথা বলছেন কেন? আর আপনিও কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছেন? আপনি এখান থেকে চলে যান, তাহলে আমিও চলে যাব। আমি এই কথা বলাতে লোকটি ভীষণভাবে রেগে গেল আর আমাকে মারার জন্য হাত তুলল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে তার কবজিতে ধরে ফেললাম। কিছুক্ষণ জোরাজুড়ি চলছে, এমন সময় দেখতে পেলাম একজন পুলিশ অফিসার আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। তখন আমার সাহস আরেকটু বেড়ে গেল। পুলিশ কাছে এসে জিজ্ঞেস করাতে আমি পুরো ঘটনাটাই বললাম। তারপর পুলিশ নিজে গিয়ে বস্তাটা খুলে দেখে বস্তার ভিতর হাত-পা-মুখ বাধা অবস্থায় একটি বৃদ্ধ লোক। তার সব বাঁধন খুলে দিলে পর বৃদ্ধ লোকটি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। পুলিশ জিজ্ঞেস করল, আপনার নাম কি? লোকটি বলল, আগষ্টিন। কে আপনাকে এ অবস্থা করল? গাছ থেকে নেমে আসা লোকটির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বৃদ্ধ লোকটি বলল, স্যার আমার ছেলে আমার এই অবস্থা করল। লোকটি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে আশে-পাশে থাকা লোকদের সহায়তায় তাকে ফেলে পুলিশ তাকে নিয়ে গিয়ে জেল খানায় আটকে রাখে।

এ দিকে আমি ভাবছি, এই বৃদ্ধ লোকটিকে নিয়ে কি করা যায়? আগ-পাছ চিন্তা না করে লোকটিকে আমার বাড়িতে নিয়ে গেলাম। তার ব্যাপারে সমস্ত কিছু জানার পর তাকে এমসি সিস্টারদের বাড়ীতে রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। সিস্টারগণ প্রথমে বৃদ্ধ লোকটিকে নিতে রাজী হয়নি। আমি অনেক অনুরোধ করার পর বড় সিস্টার আমাকে বললেন, আমরা রাখতে পারি, তবে মাঝে মাঝে আপনাকে এসে দেখা করে যেতে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে সিস্টার। তাই প্রতিমাসে একবার করে বৃদ্ধ লোকটিকে দেখতে যেতাম। এভাবে ৬ মাস কেটে গেল।

এদিকে পুলিশ যাকে জেলখানায় আটকে রেখেছিল, সে ইতিমধ্যেই ছাড়া পেয়ে গেছে। জানা গেছে বৃদ্ধ লোকটির ছেলে আরো উগ্র মেজাজী হয়ে তার বাবাকে বিভিন্ন হাসপাতালে, বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে খুঁজাখুঁজি করছিল। কোথাও না পেয়ে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। অবেশেষে অন্য এক লোকের মাধ্যমে জানতে পারল যে, তার বাবাকে এমসি সিস্টার হাউজে রাখা হয়েছে। তখন লোকটি অনেক কৌশল খাঁটিয়ে সিস্টারদেরকে নয়-ছয় বুঝিয়ে সেখান থেকে তার বাবাকে নিয়ে চলে গেল। আমি এটা জানতে পারলাম, যখন মাস শেষে এমসি সিস্টার হাউসে দেখা করতে গেলাম। আমি তখন সিস্টারকে বললাম, সিস্টর এ আপনি কি করলেন? ঐ উগ্র ছেলেটিতো তার বৃদ্ধ বাবাকে এবার মেরেই ফেলবে। এই কথা শুনে সিস্টার চমকে উঠলেন। শেষে আর দেরী না করেই বৃদ্ধ লোকটির বাড়ির ঠিকানা নিয়ে ছুটে গেলাম আমি আর বড় সিস্টার। বাড়িতে গিয়ে দেখি বৃদ্ধ লোকটির ছেলে এবং আরো কয়েকজন মিলে বারান্দায় বসে মদ খাচ্ছে। আমাকে ও সিস্টারকে দেখে লোকটি খুব রেখে গেল আর বলল, কেন আসছেন আপনারা? চলে যান এক্ষুনি! আমরা তো তোমার বাবাকে দেখতে এসেছি। কোথায় তোমার বাবা? শান্ত গলায় বললেন সিস্টার। লোকটি আরো ক্ষেপে গিয়ে বলল, আমার বাবা বাড়িতে নেই। সে বাইরে চলে গেছে। সিস্টার আবার শান্ত গলায় বললেন, আমরা কি তোমার ঘরে গিয়ে একটু বসতে পারি? বিরক্ত হয়ে লোকটি বলল, যান বিশ্বাস না হলে ঘরে গিয়ে দেখে আসেন। আমি আর সিস্টার তাদের ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখি সত্যি তার বাবা ঘরে নেই। কিছুক্ষণ ঘরে বসে থাকলাম। বাইরে চলে আসার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। এমন সময় ঘরের ভিতর থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ আসল। আমাদের বুঝতে আর বাকি রইল না যে, এই ঘরের ভিতরেই সে তার বাবাকে লুকিয়ে রেখেছে। আমি খাটের নীচে তাকাতেই দেখি, লোকটি তার বাবাকে আগের মতই হাত-পা-মুখ বেঁধে ঠান্ডার মধ্যে খালি গায়ে ফেলে রেখেছে। এবার সিস্টার রেগে গিয়ে লোকটিকে বলল, তুমি এত নিষ্ঠুর কি করে হতে পার? তোমার কি এতটুকু দয়া-মায়া নেই? তোমার বাবাকে কষ্ট দিয়ে তুমি কি শান্তি পাবে ভেবেছ? তুমি এখনই তোমার বাবাকে খাটের নীচ থেকে বের করে এনে তার সব বাঁধন খুলে দাও। নইলে আমি পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ করবো আর বলবো, যাতে তোমাকে সারা জীবন জেল হাজতে রেখে দেয়।

সিস্টারের এই কথা গুলো শুনে লোকটির মনে কিছুটা হুঁস ফিরে এলো। সে চুপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। অবশেষে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। আমি আর সিস্টার তার কাছে গিয়ে তার হাত স্পর্শ করলাম। তখন লোকটি জোরে কেঁদে ফেলল আর বলল, সিস্টার আমি অনেক বড় ভুল করে ফেলেছি। আমাকে ক্ষমা করে দেন। তখন সিস্টার বললেন, আমার কাছে নয়, তোমার বাবার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও। তখন লোকটি তার বৃদ্ধ বাবার পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইলো আর জোরে জোরে কাঁদতে লাগলো। তার বাবাও তাকে বুকে ঝড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। তাদের এই দৃশ্য দেখে আমরা আমাদের চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি।

কিছুক্ষণপর শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হলে, আমরা লোকটিকে অনেক বুঝালাম। বললাম, দেখো যারা বাবা-মাকে কষ্ট দেয়, তারা এই জগতেও যেমন কষ্ট পায়, শাস্তি পায় তেমনি পর জগতেও কষ্ট ও শাস্তি পাবে। ঈশ্বরের দশ আজ্ঞায় আছে পিতা-মাতাকে সম্মান করার কথা। ঈশ্বরের দশটি আজ্ঞার মধ্যে কেউ যদি একটি আজ্ঞারও অবমাননা করে, তাহলে সে তার শাস্তি থেকে কিছুতেই রেহাই পাবেনা। তার শাস্তি অতীব নিশ্চিত।

আমরা লোকটিকে আরো বললাম, তুমি নিশ্চয় বেশ কয়েক বছর ধরে পাপ স্বীকার করনি এবং গির্জায় গিয়ে পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদও গ্রহণ করনি, তাই না? তবে শোন, যদি কেউ অনুতপ্ত হয়ে তার সমস্ত পাপের কথা স্বীকার করে তাহলে ঈশ্বর তার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন। আবার যদি কেউ যিশুর পবিত্র দেহ বা খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করে তবে সে দৈহিক ভাবে, আধ্যাত্মিক ও মানসিকভাবে নিরাময়তা লাভ করে। তারা যে কত বেশি নিরাময় ক্ষমতা আছে, তা শয়তান থেকে বেশি আর কেউ জানে না। তাই শয়তানও প্রতিটি মানুষের পিছনে আঠার মত লেগে থাকে যাতে করে সে পাপস্বীকার না করে, গির্জায় না যায় এবং খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ না করে। সেই জন্য সর্বদা আমরা কি বলছি আর কি করছি। আশা করি এতদিন পর তুমি কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছ যে, শয়তান আমাদেরকে কেমন ভাবে হেনস্তা করে থাকে।

তাই তুমি আজই এবং এখন থেকেই মনে প্রাণে প্রতিজ্ঞা কর যে, তুমি নিয়মিত ভাবে পাপস্বীকার করবে, প্রতিদিন গির্জায় যাবে ও পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করবে। যাতে করে তুমি শয়তানের অধীনে নও বরং শয়তান যেন তোমার দেখতে পাবে তোমার কাছে, আমার কাছে, আমাদের সবার কাছে বড়দিনের শান্তি ও আনন্দ আমাদের সবার হৃদয়ে আরো কত গভীর ভাবে উপলব্ধি ও উপভোগ করতে পারি॥

হৃদয়ের শুভ্রতা

সিস্টার জুঁই ক্লারা কোড়াইয়া সিএসসি

হৃদয়ে আমার নতুন সুর বাজে
তালে তালে মন উঠে নেচে
কানে মুখে নতুন কথা শুনি
তোমার আশীর্বাদে আছি মোরা বেঁচে।
ঘন কালো অন্ধকারে
হয়েছ মোদের আলো
দিনের আলোর প্রদ্বীপ হয়ে
বাসব তোমায় ভালো।
শুভ্র তুষারের আলতো ছোয়ায়
শরীরে দোলা দিয়ে যায়
অধির হয়ে প্রহর গুনি
তোমার আশার প্রতীক্ষায়।
পানির মত সরল হয়ে
জীবনে সুখ আসে
এই পৃথিবীর দুঃখ ও অভাব
মোদের চোখে ভাসে।
হৃদয় উজার করে তাই
বাসব সবারে ভালো
জীবন তরীর প্রতিকূলে
তুমিই মোদের আলো।।

আর্বিভাব

উইলিয়াম রনি গমেজ

শীতের ছোঁয়ায় শিহরিত প্রকৃতি
ঘন কুয়াশায় আবৃত চারিধার
তবুও প্রত্যাশা সোনালী সূর্যের
জেগে উঠুক নব আলো
নতুন প্রভাতে।
বিশ্বমানব অধীর অপেক্ষায়
পূজার অর্ঘ্য সাজিয়ে
তোমারই আরাধনায়।
খ্রিস্টরাজ তুমি তো আসবে
আমাদের হৃদয় আঙ্গিনায়
নিজস্ব সত্তায়, অপার মহিমায়।
মুছে যাবে অমানিশা
তোমার আর্বিভাবে
ধন্য ধরণীতল
আনন্দধারা বইবে প্রতিক্ষণে।

ওয়েটিং রুম

জয় বার্নাড কার্ডোজা

"অবশ্যই অপেক্ষার প্রহর শেষ হবে যদি কেউ সঠিক সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে" উইলিয়াম ফল্কনার। আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই কোন না কোন মুহূর্ত আসে যাকে আমরা বলে থাকি অপেক্ষার প্রহর। যে মুহূর্তে কিছু একটা পাওয়ার প্রত্যাশা আমাদের অনেক বেশি আঁকড়ে ধরে। আমরা তার জন্য অনেক সময় সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করি। কিন্তু একের পর এক প্রহর কেটেই যায় তবুও আমাদের প্রার্থনা পূরণ হয় না। অপেক্ষার প্রহর গুলো যেন কাটেই না, মনে হয় এত দীর্ঘ রজনী জেগে আছি, কিন্তু সকাল এর সূর্য কেন উঠছে না। সেই মুহূর্ত গুলোয় আমরা খুব সহজে হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ি। বিশেষ করে সেই মুহূর্ত গুলোয় যদি দেখি সাথের কেউ একের পর এক সফলতা অর্জন করছে তাহলে তো কথাই নেই, হতাশা আরো কয়েক গুন বৃদ্ধি পায় যখন দেখেন আপনিই শুধু একা সেই ওয়েটিং রুমে বসে আছেন। আপনিই একা প্রভুর কাছে বারবার কাতর কণ্ঠে বলছেন, আর কত দেরি পাঞ্জেরী।

কেন এই অপেক্ষা

আমরা যখন কোন একটি বিষয়ে প্রার্থনা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পরি তখন স্বাভাবিক ভাবেই মনে যেই প্রশ্নটি আগে আসে তা হলো, কেন এই অপেক্ষা? তুমি কেন আমার প্রার্থনা শুনছো না প্রভু। এমন কি সামসঙ্গিতে বলা আছে আর কতকাল আমি এই চিন্তাগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ করবো? আর কতকাল আমার হৃদয় এই দুঃখ ভোগ করবে? আর কতদিন আমার শত্রুরা আমায় পরাজিত করবে? *(সামসঙ্গীত ১৩-২)* এবার তাহলে বলি কেন এই অপেক্ষা। আপনি যখনই কোন ফল পাওয়ার আশায় একটি বৃক্ষ রোপণ করবেন তার জন্য আপনাকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। প্রতিটা বৃক্ষের একটি নিজস্ব সময় আছে যখন সে ফলবান হয়। কোন কোন বৃক্ষ গ্রীষ্মকালে ফল দেয় আবার কোন কোন বৃক্ষ শীতকালে ফল দেয়। কিন্তু ফল তারা দিবেই। এখন যেই মুহূর্ত গুলোতে আপনি গাছে ফল দেখতে পাবেন না সেই মুহূর্ত গুলোকে গুরুত্বহীন ভেবে বসবেন না। কেননা সেই মুহূর্তে ভিতরে ভিতরে বৃক্ষ গুলো নিজেকে ফল দেয়ার জন্য প্রস্তুত করছে। তার উপযুক্ত সময় মত সেগুলো ফুটে উঠবে। আপনার জীবনেও যা আপনি চাচ্ছেন তার জন্য ঈশ্বর ভিতরে ভিতরে আস্তে আস্তে আপনাকে তৈরি বা প্রস্তুত করছেন। যেন আপনি সেই ফলকে নিজের মধ্যে ধারণ এবং বহন করতে পারেন। যদি আপনি সময়ের পূর্বেই কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করেন তবে আপনি তা নাও ধরে রাখতে পারেন। যেমনটি হয়েছিলো বাইবেল এর অনেক পরিচিত একটি গল্পে, যা আমরা অপব্যয়ী পুত্রের গল্প বলে জানি। এখানে ছোট ছেলেটি তার পিতার নিকট হতে অসময়ে তার সম্পত্তির ভাগ চেয়ে বসে এবং পরবর্তী সময়ে সে ঐ সকল সম্পত্তির অপব্যবহার শুরু করে যার ফলশ্রুতিতে অল্প সময়ের মধ্যে সে সব হারিয়ে পথে বসে। নিজের খাবার সংগ্রহের জন্য শেষে তাকে শূকরের ঘরে কাজ নিতে হয় এবং তাকে শূকর এর খাবার খাওয়ার আশায় বসে থাকতে হতো কিন্তু সেই খাবারও তার কপালে জুটতো না। প্রভু চান না আপনি অপব্যয়ী পুত্রের ন্যায় জীবনে এমন খারাপ সময়ের মধ্যে পড়েন। তাই তিনি আস্তে আস্তে সময় নিয়ে আপনাকে তৈরি করছেন। ধরুন আপনি পাহাড় এর চূড়ায় উঠতে চাচ্ছেন। কিন্তু আপনি এখনো ভালো ভাবে হাঁটতেই পারেন না। প্রভু নিশ্চয় আপনাকে এই অবস্থায় পাহাড়ে তুলে দিবেন না, তাহলে আপনি সেই পাহাড় থেকে পড়ে মারাও যেতে পারেন। এখন তিনি যা করবেন তা হলো আপনাকে আগে হাঁটতে শেখাবেন। হাঁটতে গিয়ে আপনি অনেক বার হোঁচট খাবেন, ব্যথা পাবেন কিন্তু এভাবে আস্তে আস্তে আপনি ঠিকই হাঁটা শিখে যাচ্ছেন, হয়তো তার জন্য কিছুটা সময় লাগছে। এই সময়টাতেই আমরা ধৈর্য হারিয়ে ফেলি এবং ঈশ্বরের এর প্রতি অভিযোগ করে বলি, তুমি কি আমার দুঃখ গুলো বুঝো না? আমাকে কেন অপেক্ষায় রেখেছো। যিশু নিজেও কিন্তু তার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন। কানা নগরের বিবাহ উৎসবে যখন সমস্ত দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে গেল, তখন যিশুর মা তাঁর কাছে এসে বললেন, এদের আর দ্রাক্ষারস নেই। যিশু বললেন, হে নারী, তুমি আমায় কেন বলছ কি করা উচিত? আমার সময় এখনও আসেনি (*যোহন* ২- ৩) যিশু নিজেও তার সময়ের আগে কিছু করেননি। তিনি জানতেন যে এই বাড়িতে দ্রাক্ষারস শেষ হবে। কিন্তু তিনি অপেক্ষা করেছেন এবং এই অপেক্ষাই যিশুর জীবনের প্রথম আশ্চর্য কাজ এর সাক্ষ্য বহন করছে।

অপেক্ষার ফল সব সময় মিষ্টি হয়

আপনি দেখে থাকবেন যে সময় নিয়ে কিছু একটা তৈরি করলে তা অনেক মজবুত হয়। হোক সেটা কোন স্থাপনা কিংবা অন্য যেকোন কিছু। এমনকি রান্না করার সময়ও দেখবেন যে রান্নাটি সময় নিয়ে আস্তে আস্তে জ্বাল দিয়ে রান্না করা হয় সেই রান্নাটি অনেক বেশি মজা হয়। চাইনিজ বাঁশ এর বেড়ে উঠার ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে দীর্ঘ সময়ের অপেক্ষার মধ্যে কি কি হয়। চাইনিজ বাঁশ যদি আপনি রোপণ করেন প্রথম ৫ বছরে আপনি যত কিছুই করেন না কেন এর মধ্যে কোন তফাৎ আপনার চোখে পরবে না। কিন্তু মজার ব্যাপার হল ৫ বছর পর ৬ মাসের মাথায় গাছটি ৯০ ফিট বাড়বে। কিন্তু এই ৫ বছর গাছটি মাটির ভিতরে বড় হচ্ছিলো, যা খালি চোখে দেখা যাচ্ছিলো না। তাই অপেক্ষার মুহূর্তে আপনার ভেতরে আপনি

কতটা বৃদ্ধি পাচ্ছেন তা আপনি যাচাই করুন। তবেই দেখতে পারবেন আপনার জীবনে হতাশার মাত্রা কমে গেছে। কারণ ঈশ্বর অবশ্যই আপনার জন্য ভালো দিন রেখেছেন *(যেরেমিয়া ২৯-১১)*। আমি আমার পরিকল্পনাগুলো কি তা জানি। তাই এগুলো তোমাদের বললাম।" এই হল প্রভুর বার্তা। "আমি তোমাদের সুনিশ্চিত নিরাপদ ভবিষ্যৎ দিতে চাই। তোমাদের জন্য আমার ভালো ভালো পরিকল্পনা আছে। তোমাদের আঘাত করবার কোন পরিকল্পনা আমার নেই। আমি তোমাদের আশা এবং সু-ভবিষ্যৎ দিতে চাই।

ঈশ্বর উপযুক্ত সময়ে দিয়ে থাকেন

আপনার অপেক্ষার মুহূর্তে ঈশ্বর আপনার জন্য কাজ করছেন। আপনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু তিনি আপনার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবটাই জানেন। তিনি জানেন আপনাকে কোন পথে নিলে আপনি গর্তে পরবেন না। কোন পথে বাঘ কিংবা নেকড়ে নেই। আপনি শুধু হার না মেনে তার দেখানো পথে চলতে থাকুন। ঈশ্বর আব্রাহামকে বলেছিলো তোমার বংশ আমি আকাশের তারার মত অগণিত করবো। বাস্তব অর্থে যেখানে আব্রাহাম এর বয়স ১০০ এবং তার স্ত্রী সারার বয়স তখন ৯০। তখন আব্রাহাম এর কাছে ও এই অপেক্ষার প্রহর কষ্টদায়ক ছিলো কিন্তু আব্রাহাম ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস রেখেছিলো। কিন্তু সারা বিশ্বাস করতে পারছিলো না। আপনি, আমি হয়তো অনেক সময় সারার মত বিশ্বাস হারিয়ে বসি। কিন্তু বাস্তব অর্থেই ঈশ্বর যা আপনাকে কথা দিবেন তা তিনি আপনার জীবনে বাস্তব করবেনই, কেননা তিনি বলেছেন আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাবে কিন্তু আমার বাক্য কখনো লোপ পাবে না। আজ আপনি হয়তো ভালো একটা সংবাদের অপেক্ষায় আছেন, হতে পারে কবে ভালো একটা চাকরি হবে, কিংবা কবে একজন মনের মানুষ এর সন্ধান হবে, কবে আমার রোগ মুক্তি ঘটবে, কবে আমার ঘরে সন্তান হবে, এরকম অনেক অনেক কিছুর জন্য আপনার অপেক্ষা। এই কষ্টের সময় গুলো অনেকটা প্রসব বেদনার মত। একজন মা যেমন ১০ মাস কষ্ট করে তার সন্তান এর জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তখন তিনি সেই কষ্ট ভুলে যান। কিন্তু এর জন্য অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে হবে। ধরুন কোন শিশু সময়ের অনেক আগে জন্ম নিলে তারা অনেক দিক থেকেই অসুস্থ হয়ে জন্ম নেয়। অনেকে আবার প্রতিবন্ধীও হয়ে যায়। এভাবেই আপনার জীবনে আপনি যেটা পাওয়ার জন্য অপেক্ষায় আছেন সেটা অবশ্যই সঠিক সময়ে পাবেন। নয়তো দেখবেন সেই অসময়ে পাওয়া বিষয়টি আপনার জীবনে আশীর্বাদ না হয়ে হয়ে উঠতে পারে অবসাদ।

যিশু আপনার অপেক্ষা দূর করবেন

বাইবেল এর আরো একটি ঘটনা, জেরুশালেমে প্রধান ফটকের কাছে একটা পুকুর ছিল এই পুকুরটির পাঁচটি চাঁদনী ঘাট ছিল; ঘাটের সেইসব চাতালে অনেক অসুস্থ লোক শুয়ে থাকত; তাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্ধ, কেউ কেউ খোঁড়া এমনকি পঙ্গু রোগীও থাকত সেখানে একজন লোক ছিল সে আটত্রিশ বছর ধরে রোগে ভুগছিল, যিশু তাকে সেখানে পড়ে থাকতে দেখলেন, তিনি জানতেন যে লোকটি অসুস্থ। তিনি তাকে বললেন, তুমি কি সুস্থ হতে চাও? সেই অসুস্থ লোকটি বলল, মহাশয় আমার এমন কোন লোক নেই, জল কেঁপে ওঠার সময় যে আমাকে পুকুরে নামিয়ে দেবে আমি ওখানে পৌঁছানোর আগেই কেউ না কেউ আমার আগে পুকুরে নেমে পড়ে। যিশু তাকে বললেন, ওঠ! তোমার বিছানা গুটিয়ে নাও, হেঁটে বেড়াও। সাথে সাথে লোকটি সুস্থ হয়ে ওঠলো। এখানে একটি বিষয় লক্ষ করুন, এর আগেও কিন্তু এই পুকুরে অনেক রুগি সুস্থ হয়েছে কিন্তু কয়জন এর নাম মানুষ জানতো? কিন্তু এই অসহায় লোকটি যিনি ৩৮ বছর অপেক্ষা করেছেন তাকে আমরা এখনো জানি এবং এটি ছিলো যিশুর ৩য় আশ্চর্য কাজ। কাজেই যারা যিশুর জন্য অপেক্ষায় আছে তাদের জীবনে অবশ্যই তিনি আর্শ্চযমূলক কিছু ঘটাবেন এবং যা বাকী সাধারণের মত না। অবশ্যই বিশেষ কিছুই ঘটবে তাদের জীবনে। আমাদের অনেকের অবস্থা এই অসুস্থ লোকটির মতো। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে যাদের ভালো একটা চাকরির দরকার। কিন্তু তার জন্য সুপারিশ করার মতো কেউ নেই, অনেকটা সেই লোকটির মতো যাকে সেই পুকুরের মধ্যে নামানোর জন্য কেউ ছিলো না। মনে রাখবেন যার জন্য কেউ নেই স্বয়ং ঈশ্বর তার জন্য আছেন এবং তিনি নিজে এসে তাদের জন্য সুপারিশ করবেন। আপনি শুধু তার অপেক্ষায় থাকুন এবং তার উপর ভরসা রেখে এগিয়ে চলুন কারণ তিনিই আপনার অপেক্ষা দূর করবেন।

প্রভু তোমায় পথ দেখাবেন, তিনি নিজেই তোমার সঙ্গে আছেন। তিনি তোমাকে ছাড়বেন না বা ত্যাগ করবেন না। দুশ্চিন্তা করো না, ভয় পেও না *(দ্বিতীয় বিবরণ ৩১-৮)* ঈশ্বর আমাদের যা দেন তা তিনি সঠিক সময়ে দেন বরং আমরাই অনেক কিছু অনেক অসময়ে চেয়ে বসি। ধরুন আপনার সন্তান এর বয়স ১০ বছর। এখন সে যদি আপনার কাছে একটা মোটরসাইকেল চায় আপনি কি তা দিবেন? ধরুন সে এটা দিয়ে স্কুলে যেতে চাচ্ছে। কাজেই এটা অনেক দরকারি কিন্তু তারপরও আপনি তাকে এটা দিতে অস্বীকৃতি জানাবেন। কিন্তু কেন? কারণ আপনি জানেন এটা চালানোর উপযুক্ত সময় এখন না। এটা দিলে সে হয়তো অনেক আনন্দিত হবে ঠিকই কিন্তু এটা তার জীবনে বয়ে আনবে অনেক বড় ধরনের দুর্ঘটনা। ঈশ্বরও আমাদের পিতা। তিনি আপনার আমার থেকে অনেক বেশি জানেন আমাদের জন্য কোন মুহূর্তে কোনটা বেশি প্রয়োজন এবং তিনি সেটা সেই সময়েই আমাদের দিয়ে থাকেন। পবিত্র বাইবেলে বলা আছে, মাতৃ জঠর এ যখন আমি ছিলাম ঈশ্বর আমাকে তখন থেকেই জানেন। কাজেই জীবনের অপেক্ষা নামক ওয়েটিং রুমে আপনি নিজেকে একা ভাববেন না। মনে রাখবেন আপনার সাথে আছে আপনার ঈশ্বর। কারন তিনি বলেছেন, আমি কোন অবস্থায় তোমাকে ত্যাগ করবো না, যুগান্তের শেষ দিন পর্যন্ত আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি॥

নারী ও ধরিত্রী

অর্পা কুজুর

নারী ধরিত্রী, নারী মা, ভগিনী, জায়া, জননী। নারী ধারণ করেন, সংরক্ষণ করেন এবং জন্ম দেন। নারী অপরিসীম ক্ষমতার আধার এবং জীবনশৈলীতে ভরপুর। নারী যদি গর্ভ ধারণ না করতেন জন্ম না দিতেন, হতে পারে এ ধরিত্রীর গতি থেমে যেত। পরিবেশের ভারসাম্য হারিয়ে যেত। ঠিক একইভাবে এই পৃথিবী বা এই ধরিত্রী আমাদের মা। এই ধরিত্রী হচ্ছে আমাদের জন্মভূমি এবং মানবজাতির একটি অভিন্ন আবাসস্থল। এই আবাসস্থলে আমরা মায়ের সন্তানের মতন করেই বেঁচে আছি। নারী যেমন তার সন্তানকে যত্ন করেন, লালন পালন করেন, বিপদ আপদে আগলে রাখেন একইভাবে ধরিত্রী মানবজাতিকে তার মাটি পানি আলো বাতাস দিয়ে, বেঁচে থাকার প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। নারীর অভিন্ন রূপ এই ধরিত্রী, আমাদের মা! নারী জন্ম দেন বলেই এই বিশ্ব ব্যবস্থা টিকে রয়েছে। আত্মনির্ভরশীল বিশ্ব ব্যবস্থার মূলে রয়েছে মানুষের শৈল্পিক চেতনা এবং বৈজ্ঞানিক কার্যপদ্ধতি যার মূলে আছে নারীর সৃষ্টি। নারী, ব্যক্তি থেকে পরিবারের সৃষ্টি করেন এভাবে সমাজ এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম নারী আমাদের সংযুক্তি ঘটান। প্রকৃতি ও নারী পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য একটি অপরিহার্য। নারী ও ধরিত্রী একটি গণমঙ্গলেরও বিষয়।

ধরিত্রীকে নারীর সাথে তুলনা একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। নারী তার জীবনের সবকিছুই সহভাগিতা করেন। পরিবারকে আলিঙ্গন করেন, স্নেহের হাত বাড়িয়ে দেন। মাতৃস্বরূপ ধরিত্রীও আমাদের আলিঙ্গন করে। আমাদের সঞ্জীবিত করে এবং পরিচালনা দান করে। ধরিত্রীর বিচিত্রময়দানে আমরা ভরপুর। ফুল, ফল, লতাপাতা, হরেকরকম গাছগাছালি, প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাদের যে আনন্দ দেয়, আলিঙ্গন করে ও রক্ষণাবেক্ষণ করে তা মাতৃতুল্য। ধরিত্রী তার পরিবেশ, মৃত্তিকা, বায়ু, ফল, জল, আকাশ, বন দিয়ে আমাদের সর্বত্র বেষ্টন করে রেখেছে। মায়ের ভালবাসার অভাবে পরিবারের যেমন ক্ষতি হয়, পরিবার নষ্ট হয়। আমাদের যত্নের অভাবে ধরিত্রীর তেমনি ক্ষতি হয়। "সম্প্রতি আমাদের এই ধরিত্রী নামের "মা" করুণভাবে আর্তনাদ করছে। কেননা দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ ও যথেচ্ছার ব্যবহার দ্বারা আমরা তাকে যারপরনাই কষ্ট দিয়ে চলেছি এবং ঈশ্বর যে সম্পদ দিয়েছেন তার অপচয় করে আমরা তাকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছি। মনে হচ্ছে আমরা যেন তার স্বেচ্ছাচারী অধিকর্তা ও প্রভু হয়ে উঠেছি। আমরা যেন যেমন খুশি তেমন ব্যবহার করে করেই লুটেপুটে খেতে পারি এমনটিই সর্বদা মনে করছি। পাপ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত আমাদের হৃদয়পটে যে সহিংসতা জন্ম দিয়েছে তার লক্ষণগুলো জলে-স্থলে নভোমণ্ডলে এবং সকল ধরণের প্রাণীর মধ্যেই প্রকটভাবে বিস্তার লাভ করেছে। ফলে ভারাক্রান্ত ও বিধ্বস্ত 'মা' ধরিত্রীও হয়ে পড়েছে আমাদের দরিদ্রের মধ্যে সর্বাধিক পরিত্যক্ত ও লাঞ্ছিত। আমরা ভুলে গেছি যে, আমরা নিজেরাও পৃথিবীর ধুলিমাত্র। এমনকি আমাদের দেহও তারই উপাদানে গঠিত। তার বাতাসই আমাদের প্রাণবায়ু এবং তার পানি থেকেই আমরা প্রাণময়তা ও সজীবতা লাভ করি (লাউদাতো সি)।"

মানব সভ্যতার সূচনা করেন নারী। কৃষি সভ্যতার সূচনাতেও রয়েছেন নারী। বলা যেতে পারে যে ধরিত্রীর বুকে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল তা নারীর হাত ধরেই। প্রাচীন যুগে মানুষ বনে জঙ্গলে, গুহায় এক সঙ্গে বসবাস করত। মানুষের সংঘবদ্ধ জীবন ছিল। মানুষ শিকার করে জীবন-যাপন করত, ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকতো। নারীরা সেই ফলের বীজ তাদের বসবাসের গুহার চারিপাশে জঙ্গলে ফেলে দিত। এখান থেকেই বিভিন্ন ফল এবং ফসলের জন্ম। কৃষি কাজের সূচনা ঘটে এভাবেই যার মূলে রয়েছে নারী। ক্রমান্বয়ে সেই কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে এবং সেই কৃষিই আজ শিল্প বিপ্লবের সূচনা করেছে, সভ্যতার উন্মেষ ঘটিয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, নারী সভ্যতার সূচনা করেছে। নারী যেমন সন্তান জন্ম দানে ধরিত্রীকে মহান করে তুলেছেন ঠিক তেমনই উৎপাদন ব্যবস্থার সূচনা করে ধরিত্রীকে সম্পদশালী করেছেন। নারী নিজেই ধরিত্রী সরূপ যেখানে রয়েছে তার অসীম ক্ষমতা। ঈশ্বর নারীর মাধ্যমে নারী পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। নারী পুরুষ সৃষ্টি করে, এই ধরিত্রীকে সুরক্ষার দায়িত্বও আমাদের হাতে অর্পণ করেছেন । নারীর জীবন আমাদের প্রতি ঈশ্বরের মহামূল্যবান দান। নারী ধরিত্রী সরূপ হলেও, সভ্যতার সূচনা করলেও নারী অবক্ষয়ের শিকার। আমাদের ধরিত্রীকে সুরক্ষা, উন্নতি সাধন, জীনযাত্রা, উৎপাদন ব্যবস্থা এবং ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের বর্তমানে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে যে কাঠামো প্রতিষ্ঠিত নারী সেখানে অবহেলিত। প্রকৃত উন্নয়ন চরিত্র থেকে নারী বঞ্চিত। নারীর প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাবোধ হলো ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ধরিত্রীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। প্রকৃতি ও নারী একটি অভিন্ন সত্তা যা ঈশ্বরের সকল সৃষ্টির মিলন ঘটায়। প্রকৃতির চরিত্র বিশ্লেষণ এবং নারীর পূর্ণাঙ্গ সত্তা বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নারী একটি রূপান্তরিত শক্তি প্রকৃতিও ঠিক তাই। একটি মাত্র ধরিত্রী এবং তা অবিভাজ্য। এখানে একে অপরের পরিপূরক এবং অনেক সমষ্টির সংযুক্তি রয়েছে। এখানে রয়েছে মানুষ, পরিবেশ, প্রকৃতি, জীবন, যৌনতা, পরিবার, সামাজিক বন্ধন ও সংস্কৃতি এবং কোনটিই একে অপরকে ছাড়া নয়। সমগ্র বিষয়কে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ধরিত্রীর অবক্ষয় হলে মানব সংস্কৃতিরও অবক্ষয় ঘটে। নারীর প্রতি সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হলে যেমন পরিবার ও সমাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয় একইভাবে ধরিত্রী প্রতি বিরুপ আচরণ প্রকৃতির ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে।

নারী মানুষ এবং প্রকৃতি। অদূর ভবিষ্যতে আমরা একটি টেকসই সমাজ চাই টেকসই পরিবেশ অর্থাৎ বাসযোগ্য পৃথিবী বা ধরিত্রী চাই। সবকিছুতেই রয়েছে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। একটি টেকসই সমাজ বিনির্মাণে পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ যেখানে নারী সুখি পরিবার গঠনে সহায়তা করেন। বাসযোগ্য পৃথিবীর জন্য টেকসই পরিবেশ একটি প্রযোজনীয় বিষয়। অর্থাৎ নারী ও প্রকৃতি সমার্থক। ঈশ্বরকে বা আমাদের স্রষ্টাকে আমরা চোখে দেখিনা। তার সৃষ্ট প্রকৃতির অজস্র উপাচারে আমরা তাকে উপলব্ধি করি। প্রকৃতি সৃষ্টিশীল, গতিময় ও সুন্দর। প্রকৃতি জীবনেরও উৎস। প্রকৃতি স্রষ্টা এবং নারীও প্রকৃতিসরূপা। নারীও স্রষ্টা। নারীর মধ্যে জীবনের রস আলো হাওয়া একত্রে সন্নিবেশিত। সৃষ্টি, সৌন্দর্য কল্যাণ নারীর মধ্যে আছে এই তিনের সমন্বয়। যা প্রকৃতিরও মূল শক্তি। মানুষ প্রকৃতির অংশ। প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন ধর্মে নারীকে সৃষ্টি ও সমৃদ্ধির প্রতিক হিসাবে দেখানো হয়েছে।

নারী ও ধরিত্রী দুটোই আমাদের জীবনের প্রত্যক্ষ অংশ। নারী ও ধরিত্রী মানুষের কল্যাণ ও গণমঙ্গলের বিষয়। আমরা যেন কখনই নারী ও ধরিত্রীর সমস্যা ও কষ্টের কারণ না হই। পোপ বেনেডিক্ট বলেছেন "আমরা যেন স্বীকার করে নিই যে, আমাদের দায়িত্বজ্ঞানশূন্য আচরণ দ্বারা প্রাকৃতিক পরিবেশ গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সাথে সাথে সামাজিক পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে *(লাউদাতো সি- পৃষ্ঠা: ৯)*।" আমরা যেন আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করি। নারীর মর্যাদা রক্ষা করি অনিন্দ্য সুন্দর ধরিত্রী গড়ে তুলি॥

বর্তমান প্রেক্ষিত: যুবদর্শন ও খ্রিস্টীয় মুল্যবোধ

ফাদার ড. মিন্টু লরেন্স পালমা

ছবি: ইন্টারনেট

জীবনের শিশুকাল থেকে বার্ধক্যে এই দীর্ঘ জীবন পরিক্রমায় যুবাবস্থা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বলা হয় যুবারা হচ্ছে ভবিষ্যতের আশা, জাতির মেরুদণ্ড, জীবনের মেরুদণ্ড, সমাজের ইঞ্জিনঘর। এটা হলো কোন একটা কিছু করার ও কোন একটা কিছু হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ ও সময়। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম অত্যন্ত সুন্দরভাবে এর যথার্থ পরিচয়টা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, 'বিপুল যার আশা, ক্লান্তিহীন যার উদ্দীপনা, বিরাট যার ঔদার্য, অফুরান যার প্রাণ, অটল যার সাধনা, প্রেম যার সৌন্দর্য, ত্যাগ যার প্রাচুর্য, সংস্কার যার বিপ্লব, মুক্তি যার সংগ্রাম সেটাই যুবাবস্থা'। বলা হয় যৌবন যার সৎ, সুন্দর ও কর্মময় তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ভবিষ্যতে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, যে কোন পরিস্থিতিতে জীবনকে দৃঢ়ভাবে সামাল দেওয়ার জন্য, জীবনে সুখ-ভোগ, উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভের জন্য, সুষ্ঠু পরিবার গঠনের জন্য এবং কল্যাণমুখী জীবন-যাপনের জন্য তার সঠিক শিক্ষা, দীক্ষা, গঠন প্রশিক্ষণ-এর গুরুত্বপূর্ণ সময় ও ভিত্তি হলো এই যুবকাল। এটা নিশ্চিত সত্য যে, এই সময়টায় যে বা যারা সঠিক শিক্ষা দীক্ষা নেয়নি বা পায়নি, এই সময়টায় যারা গা ভাসিয়ে নীতি-নৈতিকতা বিরুদ্ধ জীবন উপভোগ করে পার করে, এই সময়ে যারা বিভিন্নভাবে নেশা-আসক্তিতে জড়িয়ে পরে, এই সময়ে যারা বাপ-দাদার টাকায় বিলাসী-আয়েশী-অলসী জীবন-যাপন করে, এই সময়ে যারা পারিবারিক অশান্তি ও পিত-মাতার বিচ্ছেদের পরিবেশে জীবন-যাপন করে, এই সময়ে যারা ভাই-বোনের অভাব ও অনুপস্থিতির মধ্যে একা নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করে, এই সময়ে যারা পিতা-মাতার কুদৃষ্টান্তে জীবন-যাপন করে এবং বাছ-বিচার না করে যারা মোহ-আবেগ-আসক্তির বসে কারো সাথে জৈবিক সম্পর্কে জড়িয়ে পরে তারা ভবিষ্যতে কঠিন জীবন বাস্তবতায় টিকে থাকতে পারবে না। তাদের নিজের জীবন এলোমেলো হবে, পরিবারে বোঝাও হতে পারে, অসামর্থ ও ব্যর্থ হবে এবং অনেক সমস্যার কারণ হবে। বর্তমান প্রযুক্তির যুগটা কিন্তু যুবাদের আরো অসহায়-অরক্ষিত ও আক্রান্ত করছে। সুতরাং নিজের পরিচয়, অবস্থা, অবস্থান ও জীবনমান সম্বন্ধে সজাগ-সচেতন থাকা, সঠিক মুল্যবোধে জীবনদর্শন গড়ে তোলা, নিজেকে গঠন করা, ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নির্ধারণ করে দৃঢ়তার সাথে গন্তব্যে এগিয়ে যাওয়া অত্যন্ত জরুরী। যুব-যৌবন একটা সম্পদ। কোনভাবেই যেন তার অপব্যবহার ও অযত্নে নিজেরা আপদ-বিপদের কারণ না হয়।

সত্তরের দশকে একজন কবি তখনকার যুবসমাজকে উদ্দেশ্য করে কবিতার আকারে লিখেছিলেন, 'আমি জানি না আমি কে? আমি জানিনা আমি কেন? আমি জানিনা আমি কোথায়? আমি জানিনা আমি কখন? তিনি তখনকার যুবাবস্থার পরিচয়ের সংকটকেই (Identity Crisis) ইঙ্গিত করেছিলেন। পঞ্চাশ বছরে প্রযুক্তির আশীর্বাদে যুগটা/জগতটা অবিশ্বাস্যভাবেই পাল্টে গেছে এবং তা দ্রুতগতিতেই মানব সমাজকে উলট-পালট করে দিচ্ছে। এর ফলে মানুষের মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টি-ভঙ্গি, ভাব-স্বভাব, আচার-আচরণ, দিক-দর্শন সব কিছুর উপর অপ্রতিরুদ্ধ প্রভাব পরেছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক জীবনে মানুষ অতীতে কখনোই যুগের এইরূপ পরিবর্তন দেখেনি যা বিগত কুড়ি/তিরিশ বছরে দেখেছে। এর পাশাপাশি এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে আবার এই প্রযুক্তির মহা প্রতাপ ও দাপটের এই যুগেই আবার করোনা (Corona) মানুষকে ও পৃথিবীকে দুর্দান্তভাবে অসহায় শক্তিহীন ও স্থবির করে গেছে মহাকালের ইতিহাসে মানুষ যার অভিজ্ঞতা কখনোই করেনি। আর প্রযুক্তি, আকাশ-সংস্কৃতি ও করোনা এই দুইয়ের প্রভাবে বর্তমানকালে শিশু, কিশোর, যুবক-যুবতীরাই সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত বিভ্রান্ত ও অশান্ত হয়েছে। তাদের মনসুত্ব দেখে সহজেই বুঝা যায় সহজাত-সনাতন যে তরুণ ও যুবাবস্থা আমরা ভাবি তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে যা বর্তমানে তাদের জীবন আচরণ, মনন ও দর্শনে লক্ষ্যণীয়। আসলে জীবনবোধ, মানববোধ, বিশ্বাসবোধ, ধর্মবোধ, নীতিবোধ, আচারবোধ, আদর্শবোধ সব কিছুতেই তাদের নতুন এক দর্শনবোধ তৈরি হয়েছে যা তাদের সহজাত পরিচয়ের সংকট বলাই যায়। তাছাড়া এই জীবন-দর্শনবোধকে একটা নতুন লক্ষণ হিসাবে দেখতে হচ্ছে যা আসল যুবাবস্থার উপাদান গুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে বর্তমান অতি প্রাযুক্তিক প্রভাবে বিষক্রিয়ার মত বিস্ফোরিত হচ্ছে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও আবিষ্কারগুলো মানুষের জীবন-মান সহজ, সমৃদ্ধ ও উন্নত করার জন্য কিন্তু তার অপব্যবহার মানুষের জীবনমান ও মন বিভিন্নভাবেই সস্তা, দুরাবস্তা ও অবনত করে দিচ্ছে। প্রথমত Mass media and social media, Internet. Facebook -র সহজলভ্যতা সেই কচি ও শিশু অবস্থা থেকেই এর সৌখিন ও স্বেচ্ছাচার ব্যবহারের ফলে মানবিক শক্ত ভিত্তি নিয়ে বড় হতে বা বৃদ্ধি পেতে সক্রিয় ভুমিকা রাখতে ব্যর্থ। কারণ

সেখানে চিন্তাশক্তির গভীরতা, সৃজনশীলতা ও সহজাত বুদ্ধির যে স্বকীয়তা তার চর্চার প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। অর্থ্যাৎ যখন যা পাওয়ার না তাই পাচ্ছে, যা দেখার না তাই দেখছে, যা হওয়ার না তাই হচ্ছে, যা ভাবনার না তাই ভাবছে, যা করার না তাই করছে। যেগুলো বিধি নিষেধ, যেখানে শাসন বারণ সেইগুলোতে বাধাহীন অবাধ বিচরণ। যখন যেখানে যে গুলো খেটে-ঘেটে শিখতে হয় সেখানে এই প্রযুক্তির নেটে গিয়ে সহজেই গিলে খাচ্ছে। এতে জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো বুঝার সুযোগ নেই। কষ্ট, খাটুনি, অভাব, কায়িক শ্রম, ত্যাগ ও ধৈর্য শাসন-বারন অভিজ্ঞতা করার সুযোগ নই।

বর্তমান বাস্তবতায় বৈষয়িক এই লাগামহীন প্রাযুক্তিক ঝাপটায় এর প্রতিরোধক তেমন কোন নীতিনির্দেশিকা সুনির্দিষ্টভাবে না থাকায় যুবযত্নে ও গঠনে অনেক ঘাটতি লক্ষ্যনীয়। তাদের দায়িত্ববোধ শিক্ষায় ঘাটতি, তাদের কর্মঠ ও শ্রমশীল হওয়ার শিক্ষায় ঘাটতি, নীতিবোধ শিক্ষায় ঘাটতি, সততা শিক্ষায় ঘাটতি, ত্যাগস্বীকার শিক্ষায় ঘাটতি, বিশ্বাসের চর্চায় ও শিক্ষায় ঘাটতি, তাদের হৃদয়বৃত্তির চর্চায় ঘাটতি, সমাজবোধ শিক্ষায় ঘাটতি, সহভাগিতা শিক্ষায় ঘাটতি, সহনশীলতা শিক্ষায় ঘাটতি, শাসন-সংশোধন শিক্ষায় ঘাটতি, না বলতে বা না শুনার মানা-মানসিকতা শিক্ষায় ঘাটতি, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার শিক্ষায় ঘাটতি, কথা শুনতে নমনীয়তা শিক্ষায় ঘাটতি, মানবিকতাবোধ শিক্ষায় ঘাটতি। এটা বলছিনা যে এইগুলো তাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে শিক্ষা দিতে হবে তবে প্রযুক্তির প্রকট প্রভাবের পাশাপাশি সমভাবে মানবিক ও নৈতিক স্বভাবের চর্চাগুলোর অভাব-এর ফলে যুবস্বভাবের বর্তমান বিভিন্ন দিকগুলো অন্য রূপে অর্থ্যাৎ বিরূপে প্রকাশ ঘটছে।

যুবারা হলো সম্পদ। কিন্তু এই যুগ-জাগতিকতা-বিশ্বায়ন-বৈশ্বয়িকতা নানাভাবে এই যুব সম্পদটার সমৃদ্ধির চেয়ে সমূহ সমস্যার মাঝে জড়িয়ে নিচ্ছে। যে কারণে সবচেয়ে গুরুতর সমস্যাটা হলো জীবনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য মূল্যায়ন করার ঘাটতি লক্ষ্যনীয়। তাছাড়া তাদের মধ্যে তৈরি হওয়া নীতিবোধের অভাব, মানবিকবোধ ও সামাজিকবোধের অভাব, ধর্মবিশ্বাসবোধ ও চর্চায় উদাসীনতা, সততা ও স্বচ্ছতার অভাব যুবসমাজের বড় একটা অংশের মধ্যে পেয়ে বসেছে। তারপর আর একটা বড় বিষয় হলো তাদের মাটির সাথে সম্পর্ক নাই, দেশাত্ববোধের ভিত্তি দুর্বল। প্রযুক্তির ব্যবহারে সব কিছু সহজলভ্যতায় ও Instant ব্যবস্থায় প্রকৃত সাধনা নাই। সাধনা ছাড়া সহজলভ্য জিনিষ টিকে না, এর স্থায়িত্ব নেই। এইগুলো অস্থিরতা, কৃত্রিমতা ও ভাবাবেগ বাড়ায় অর্থ্যাৎ চিন্তা চেতনায় ধীরতা ও দৃঢ়তা থাকে না।

এখন প্রযুক্তিই মানুষের জন্য চিন্তা করে রাখে, কাজ করে রাখে। মানুষকে খাটতে দেয় না, ঘাটতে দেয় না। এভাবে নিজের স্বকীয় চিন্তাশক্তি ও মননশীলতা অক্ষম করে দিচ্ছে। প্রযুক্তি যুবাদের রাতকে হারাম করে দিচ্ছে। দিনের রুটিন নষ্ট করে দিচ্ছে। এতে মনের শৃংখলা, জীবনের শৃংখলা নষ্ট করে দিচ্ছে। জীবনের স্বাভাবিক নীতি ও প্রকৃতিতে বিকৃতি ঘটছে। প্রযুক্তি অনেকটাই বুদ্ধি, মাথা-মগজের কাজকেই প্রাধান্য দেয়, হৃদয়-মন-মননশীলতাকে নয়। ইচ্ছা-বাসনা পুরণে বাধাহীন সহজপ্রাপ্য মাধ্যম হওয়ায় বাস্তবতাকে ভাবতে দেয় না। অন্যদিকে মোহ-আবেগের তাড়না বাড়িয়ে দেয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো সঙ্গ-সমাজ-সম্পর্কের আন্তরিকতায়, সাবলীলতায় ও নান্দনিকতায় বিরূপ-বিকৃত প্রভাব। তাদের মধ্যে সম্পর্কে জৈবিকতার প্রাধান্য পায় ও তাড়না বাড়ায়। যার ফলে স্থিরতা ও স্থায়িত্বের অনেক অভাব লক্ষ্যনীয়। এই পর্ণ-প্রযুক্তিরই আগ্রাসী প্রভাবের জন্যই যুবাদের মধ্যে বিবাহপূর্ব অবাধ জৈবিক-যৌন সম্পর্কের ব্যাপকতা ও বেপরোয়া ভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন তারুন্য থেকেই সম্পর্ক গড়ে উঠছে। তাও আবার দেহজ সম্পর্ক। এই সম্পর্ক আবার একজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বহুগামীতায় বিস্তার ঘটে। তাই সম্পর্কের মধ্যে কমিটমেন্ট নাই, গভীরতা নাই, স্থায়িত্ব নাই, বিশ্বাস-বিশ্বস্ততা নাই, নীতি-নৈতিকতা নাই, আন্তরিকতা নাই। তাদের মধ্যে মিথ্যা আশ্বাসে বিশ্বাস নষ্ট হচ্ছে, চালাকি-চাতুরতায় সম্পর্কে চরম অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে, সবকিছু ঠুনকু-হালকাভাবে দেখছে, হতাশা নিরাশা বাড়ছে। জীবনকে মুল্যহীন ভাবছে, অনেক কিছুর মধ্যেও নিসঙ্গতা বাড়ছে। জীবনকে বুঝার আগেই অনেকে নিজের জীবন দিচ্ছে।

আবার তাদের উপর সবচেয়ে বড় প্রভাব ফেলছে দেশের কুরাজনীতি। রাজনীতির দূষণীয় পরিবেশ, কিশোর গ্যাং সৃষ্টি হচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলবাজীর অসুস্থ পরিবেশ, টাকা ছিটিয়ে সাবটেজ করা ভয়ানক এক অসুস্থ সংস্কৃতির দ্বারা যুবরা আক্রান্ত। নীতিবোধ বিবর্জিত রাজনীতিবিদরা তাদের স্বার্থে যুবসমাজকে ব্যবহার করছে। বর্তমান বাস্তবতায় আরো কিছু লক্ষ্যনীয় বিষয়গুলো হলো তাদের মধ্যে কঠিন মনস্তাত্বিক চাপ। বর্তমান যুগটা হলো প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ। প্রযুক্তির দৌরাত্বে জগত দৌড়াচ্ছে। সেই অনুপাতে আমাদের যুবারা তাল মিলিয়ে চলতে না পেরে এর লোভনীয় সস্তা বিষয়গুলোকে গ্রহণ করে অনেকে অনেকটা বেতাল অবস্থায়ই আছে। বিভিন্নভাবেই যুবারা মনস্তাত্বিক সমস্যায় আছে। পড়াশুনা নিয়ে, ক্যারিয়ার নিয়ে, সম্পর্ক নিয়ে, বেকারত্ব নিয়ে, আর্থিক সংকট নিয়ে, পারিবারেক ভাঙ্গন নিয়ে, প্রেমে ব্যর্থতা নিয়ে, নিজের বিফলতা নিয়ে, সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে।

প্রযুক্তির ব্যবহার তরুণ-তরুণী বয়সের মধ্যেই অনেক চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছে। এই চাহিদার সাথে সাধ্য-সামর্থ্যের ভারসাম্যহীনতা তৈরি হচ্ছে। এমনিতেই পড়াশুনার খরচের চাপ অনেক বেশি। অনেক বাবামার সীমিত আয় থেকে দেওয়া টাকা শুধু পড়াশুনা ও থাকা-খাওয়ার জন্য কিন্তু তার হাত খরচ, মোবাইল খরচ তার চেয়েও বেশি। আর সেটার জোগার কিভাবে হবে? তারা বিভিন্ন উপায়ে তা করে নেয়। শুনতে ভালো না লাগলেও বলতে হয় সেটা আসে সেক্স বিক্রি করে। বড় একটা সংখ্যা এর মধ্যে জড়িত। অন্যদিকে যাদের পিতামাতার অঢেল আয়-অর্জন সেই সন্তানেরা কিভাবে তা খরচ করে তার হিসাব নেয় না। অতি আদরে বাদর হয়। যুবারা যারা নিজে আয় অর্জন না করে পিতামাতার উপর নির্ভর করে চলে বা পড়াশুনা করে তাদের সীমিত পয়সায় যেমন সমস্যা আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাওয়াতেও সমস্যা। এখানে তা ব্যবহারে ও মিতাচারে তাদের নৈতিক কোড অনেক দুর্বল।

বর্তমানে আগের চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যক যুবক-যুবতীরা নেশা-মদাসক্তে জড়িয়ে পড়ছে। অবাক করার বিষয় হলো পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও মদ নেশায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। তারা বিভিন্ন অপরাধমুলক কাজেও জড়িয়ে পরছে। ছেলেমেয়েরা হোটেল রেষ্টুরেন্টে মদ নিয়ে গিয়ে সময় কাটাচ্ছে। এখানে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাও কম যায় না। উৎসাহ-উদ্দীপনা যুবাদের বৈশিষ্ট্য হলেও এর বিপরীত উদাস-উদাসীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক ধরনের Indifferent আচরণ তৈরি হচ্ছে। পারিবারিক বন্ধন শিথীল হচ্ছে। পারিবারিক ও দাম্পতিক বিচ্ছেদ-ভাঙ্গনের ফলে সন্তানেরা মনস্তাত্বিক Complex -এ ভুগছে। আর এর প্রভাব খুব গুরুতরভাবে তাদের নিজেদের বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনে পড়ছে। বর্তমানে সবচেয়ে রড় সামাজিক ব্যধি হলো বিবাহ ভাঙ্গন ও বিচ্ছেদ। আর তার অধিকাংশই ঘটে

যায় বিবাহের কয়েক মাস ও বছরের মধ্যে। কারণ হিসাবে অধৈর্য, অসহিষ্ণুতা, আমিত্ববোধ ও অসততা তো আছেই, তবে এর মধ্যে বড় কারন হলো পরকীয়া। আর এই যুবাবস্থায় এই রকম ধস্-ধকল-ধাক্কা ব্যক্তিজীবন বিবাহ, পরিবার, সম্পর্ক, পেশার মত অনেক কিছুর উপরই প্রভাব পড়ে এবং তা সামাল দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসাও কঠিন হয়ে পরে।

এই যুব যুগ লক্ষণগুলো অবশ্যই ভাবনার বিষয়। পয়সার যেমন অপর পিঠ আছে তেমনি যুববাস্তবতার আর একটা দিকও রয়েছে। বর্তমান দশ দিগন্ত সমস্যা, প্রতিকুলতা ও চ্যালেঞ্জের মধ্যেও নিজেদের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, সুস্থ, সুন্দর, মানবিক মান সম্পন্ন করে নিজেদের গড়ে তোলার জন্য অনেকেই আবার সংগ্রাম করে যাচ্ছে। অনেক পিতামাতা তাদের সন্তানদের একটা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অক্লান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছে। বর্তমান অসততা ও নীতি বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতেও অদম্য দৃঢ়তা নিয়ে, পিতামাতার স্নেহ-সতর্কতার মধ্যে জীবনকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে নেবার প্রচেষ্টা রয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে বড় দুঃখের বিষয় হলো পিতামাতাগন তাদের বিদেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করে অজানা এক সুখের সন্ধানের আশায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। এটা আমাদের খ্রিস্টান সমাজে বেশী লক্ষ্যনীয়। অনেক সুযোগ-সুবিধার পরেও আমাদের খ্রীষ্টান ছেলেমেয়ে, যুবক-যুবতীরা, বিশেষ করে ছেলেরা শিক্ষায়, ক্যারিয়ারে, বিভিন্ন বিচিত্র পেশায় জীবন গড়তে অনীহা রয়েছে। রাজনীতি করতে অনীহা, প্রশাসনিক/সামরিক পেশায় অনাগ্রহ, ক্রীড়ায় অনাগ্রহ, শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চায় একটা পর্যায়ে ও শুধু নিজেদের গোটানো সমাজেই সীমাবদ্ধ। যুব উন্নয়ন ও মুক্তির অনেক দিক আছে। তবে বেঁচে থাকার জন্য উচ্চ শিক্ষা ও উন্নত অর্থনৈতিক স্বচ্ছল জীবনই সব নয়, দরকার যুবমানসের সামগ্রিক গঠন ও মুক্তি। তাদের আত্ম-সচেতনতা বৃদ্ধি করা, মানবিক ও নৈতিক মুল্যবোধ জ্ঞানে দর্শনে সমৃদ্ধ করা অত্যন্ত জরুরী।

আসলে যুব দর্শন সুস্থ সুন্দর জীবনের জন্য সঠিক গঠন লাভ, গতির সাথে সঠিক গন্তব্যে চলা, জীবনকে ভালোবাসা, জীবনটা নিজের জন্য শুধু নয় অপরের জন্য, পরকল্যাণে এই চেতনায় জাগ্রত থাকা। তাই নিজেকে সেইভাবে গড়ে তোলা। জীবনে লক্ষ্য নির্ণয় করে নিজেকে গঠন করা। যুব গতিই যথেষ্ট নয় এর জন্য গন্তব্য থাকতে হয়, তাই গন্তব্যে স্থির থাকতে হয়। তার জন্য দৃঢ়তা দরকার। একনিষ্ঠতা দরকার। আত্মবিশ্বাস দরকার। কর্মস্পৃহা দরকার। সাহসী-সংগ্রামী ও সংস্কারমুখী হতে হয়। যুব দর্শন হলো 'আমি পারবো'। যীশু ছিলেন একজন যুবক। তার অধিকাংশ শিষ্য ছিল যুবক। যিশুর বিপ্লবী বাণী 'বন্ধুর চেয়ে জীবন দেওয়ার চেয়ে বড় ভালোবাসা আর নেই" *(যোহন ১৫: ১৩)*। এটা যুব প্রাণের কথা। এটাই যুব বৈশিষ্ঠ্য। এটা যুব আধ্যাত্মিকতা। তিনি সমাজের কুসংস্কার, অন্ধতা, সমাজের প্রাণহীন দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থা ও অন্যায়-অসত্যের মুলে আঘাত করেছেন। যেখানে থাকবে গতি, গন্তব্য ও প্রগতি, যেখানে থাকবে আত্মবিসর্জন, আত্মত্যাগ, যেখানে থাকবে মনের ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা, যেখানে থাকবে সর্বজনীন মঙ্গল ও কল্যাণ ও মানব মুক্তি। তাদের প্রতি যিশুর প্রেরণার বাণী, 'তোমরা কাজে এগিয়ে যাও, তোমরা সফল হও, স্থায়ী হোক তোমাদের কাজের ফল *(যোহন ১৫: ১৬)*।'

কয়েকজন পরিচিত কবি-দার্শনিকদের উক্তি যা আমাদের যুবাদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে তা আবার এখানে একটু স্মরণ করি। কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী যেমন বলেন, 'আশার তপন, নব যুবগণ, সমাজের ভাবী গৌরব কেতন, তোমাদের 'পরে জাতীয় জীবন, তোমাদের 'পরে উত্থান-পতন, নির্ভর করিছে জানিয়ো সবে'। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'তোমরা সমাজের ভবিষ্যৎ। তোমরা প্রকৃত মানুষ হলে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল, কল্যাণ হবে। নিজেকে কখনো দুর্বল মনে করো না। সব সময় ভাববে আমি নিত্য শুদ্ধ, মুক্ত এক আত্মা । মানুষ ভুত ভাবতে ভাবতে ভুত হয়ে যায়। দুর্বল চিত্তের মানুষ আত্মদর্শন লাভ করতে পারে না'। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'তোমরা যুবাবস্থায় থাক। কাপুরুষের মত নিজেদের পরিচয় দিও না। তোমাদের একটা লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন। উদারমন, নিষ্ঠাবান হয়ে তোমাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চল। তোমরা ভাব-প্রবণতার পরিবর্তে বুদ্ধি জ্ঞান বিকাশের চেষ্টা কর। তোমরা অজ্ঞতা, মূঢ়তা, অন্ধতা, জড়তা ও স্বার্থ-সংস্কারের বন্ধন কাটিয়ে যা দেখছ তা সত্য করে দেখ, যা বলছ তা সত্য করে বল, যা হচ্ছ তা সত্য করে হও এবং যেখানে আছ সেখানে সত্য করে থাক'।

পোপ সাধু দ্বিতীয় জন পল বলেছেন, 'তোমরা মণ্ডলীতে ও সমাজে জীবন্ত শাখা প্রশাখা হয়ে ওঠ। যে শাখা সত্যিই ফলশালী। এই জীবন্ত শাখা প্রশাখা হওয়ার অর্থ হলো সমাজের উন্নয়নে, পরিবারের শান্তির জন্য ব্যক্তিক ও সামাজিক পরিবর্তনে, সংস্কার কাজে, গণমঙ্গল সাধনে মঙ্গলসমাচারের শিক্ষার ভিত্তিতে সুস্থ সমাজ ও পরিবার গড়ে তুলতে দায়িত্ব গ্রহণ কর'। তিনি আরো বলেন, 'মণ্ডলী মঙ্গলবাণী প্রতিষ্ঠার তাগিদ আহ্বান অনুভব করছে। সেখানে তোমাদের উপস্থিতি ও সাহায্য একান্তভাবেই প্রয়োজন। তোমাদের কর্মস্পৃহা, তোমাদের অকৃত্রিমতা, তোমাদের সদিচ্ছা, তোমাদের সজীবতা, তোমাদের দৃঢ় প্রত্যয় ও কল্যান কাজের প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। কাজেই তোমাদের যুগের বৈশিষ্ট্য উদারতা ও উদ্দীপনা নিয়ে তোমাদের যুব বৈশিষ্ট্য যৌবন সুলভ প্রতিভাগুলো সমাজ, পরিবারে ও মণ্ডলীর কল্যাণে ব্যয় কর'।

পবিত্র বাইবেলে যুবদর্শনের উপর অনেক সুন্দর উপদেশ রয়েছে। ১ তিমথী ৪: ১২ তে বলা হয়েছে, 'তুমি যুবক মানুষ বলে কেউ যেন তোমাকে উপেক্ষা না করে। তুমিও কিন্তু কথাবার্তাও আচার-আচরণ ও ব্যবহারে এবং ভালোবাসা, বিশ্বাস ও শুচিতায় সকল বিশ্বাসীর সামনে আদর্শবান হও'। উপদেশক বলেন, 'হে যুবক তোমার তরুণ বয়সে আনন্দ কর, তোমার এই যৌবন কালে তোমার হৃদয় উৎফুল্ল হোক, তোমার হৃদয়ের যত পথ, তোমার চোখের বাসনা, সবই পালন কর, কিন্তু স্মরণে রেখো পরমেশ্বর এই সমস্ত কিছুর বিষয়ে তোমাকে বিচার মঞ্চে আহ্বান করবেন' (উপদেশক ১১, ৯)। ২ তিমথী ২:২২ -এ বলা হয়েছে, 'যৌবনের যত দুর্মতি এড়িয়ে চল, যারা শুদ্ধ হৃদয়ে প্রভুকে ডাকে, তাদের সংগে যোগ দিয়ে ধর্মময়তা, বিশ্বাস, ভালোবাসা ও শান্তির অন্বেষণ কর'। সাম-সঙ্গীত বলে, 'তরুণ কিভারে বিশুদ্ধ রাখবে প্রভুর পথ? সে মেনে চলুক তোমার বাণী' *(সাম-সঙ্গীত ১১৯:৯)*। বিলাপ-গাথায় আছে, 'তরুণ বয়স থেকে জোয়াল বহন করা মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর' (৩: ২৭)। উপদেশক বলেন, 'তোমার হৃদয় থেকে ক্ষোভ দূর করে দাও, শরীর থেকে দুঃখ সরিয়ে দাও, কারন তরুন বয়স ও কৃষ্ণবর্ণ চুল দুটোই অসার' *(উপদেশক ১১: ১০)*। প্রবক্তা ইসাইয়া যুবাদের অনুপ্রাণিত করে বলেন, 'তিনি ক্লান্তকে শক্তি দেন, শক্তিহীনের বল বৃদ্ধি করেন, তরুণেরা যারা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়, যুবকেরা যারা হোঁচট খেয়ে লুটিয়ে পড়ে, কিন্তু যারা প্রভুতে আশা রাখে, তারা নবীণ শক্তি লাভ করে। তারা ঈগলের মত ডানা মেলবে, দৌড়ে শ্রান্ত হবে না, হাঁটলে ক্লান্ত হবে না (ইসা ৪০: ২৯-৩১)। এইগুলোর মধ্যে প্রকৃত যুবাবস্থা, তার পরিচয়, তার করণীয় ও সচেতনতার ব্যাপারে সুন্দর দিকদর্শনগুলো রয়েছে॥

তথ্য প্রযুক্তির যুগে পরিবারে, সমাজ ও মণ্ডলীতে চ্যালেঞ্জের ধরণ ও তা উত্তরণে করণীয়

ফাদার পল গমেজ

বর্তমান পৃথিবীতে অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে পৃথিবী মানুষের কাছে এবং মানুষ পরস্পরের অতি নিকটে এসে পড়েছে। এই আধুনিক প্রযুক্তির উন্নয়ন, মানব সভ্যতা বিকাশে, শিক্ষার আলো বিস্তারে, জাতি-গোষ্ঠীর ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও মানব মনের বিকাশে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। মানুষ প্রতিনিয়ত অনেক নতুন কিছু আবিষ্কার করছে এবং মানব জীবনের অনেক নতুন স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে। জীবনযাত্রা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটছে। মোট কথা পৃথিবীটা যেন ছোট হয়ে আসছে এবং সবকিছু এখন মানুষের আয়ত্বে বা নাগালের মধ্যে। তাই এ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও প্রগতিশীল মানব সভ্যতা ও জীবনের পরিবর্তনে শুভ প্রভাব তথা সুন্দর দিকগুলোর পাশাপাশি কিছু মন্দ দিকও রয়েছে। আর এসবের অশুভ প্রভাব পরিবার, সমাজ ও মাণ্ডলীক জীবনে পড়ছে; যেগুলো মঙ্গল বা কল্যাণ, উন্নয়ন বা পরিবর্তন না এনে বরং এনে দিচ্ছে পরস্পর-বিরোধী জীবন ধ্বংসাত্মক হুমকি এবং ভবিষত অনিশ্চিত জীবনযাপনে অশনি সংকেত। বর্তমানে এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত উন্নয়নের যেসব অশুভ প্রভাব আমাদের পরিবার, সমাজ ও মাণ্ডলীক জীবনে পড়ছে তা আমি আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার আলোকে নিম্নে সংক্ষেপে কিছুটা তুলে ধরছি।

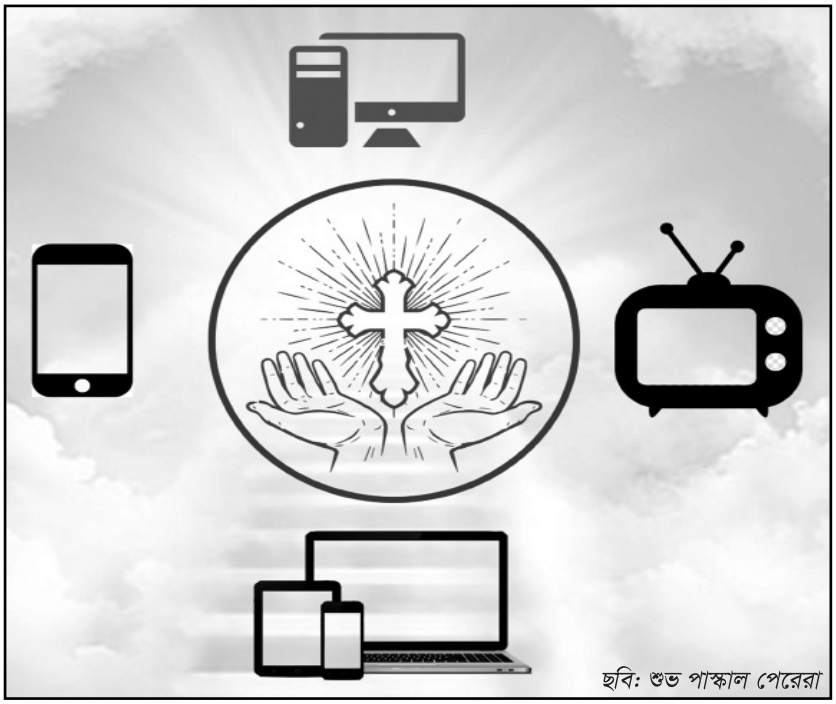

ছবি: শুভ পাস্কাল পেরেরা

পারিবারিক জীবন

পরিবার সমাজের একটি ক্ষুদ্র সক্রিয় অংশ এবং পরিবারগুলো নিয়ে একটি সমাজ গড়ে ওঠে। কোন সমাজ সুস্থ, সক্রিয় ও জীবন্ত কিনা তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে পরিবারগুলোর সুন্দর জীবনযাপন ও পারস্পরিক সম্পর্কের আদান-প্রদান, জীবন সহভাগিতা ও সুষ্ঠু যোগাযোগ রক্ষা করার মধ্য দিয়ে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির উন্নয়নের যুগে আমাদের পরিবারগুলো মোটেও সুস্থ নয়। আমার দৃষ্টিতে কারণগুলো হলো- শিক্ষিত হওয়া তথা উচ্চশিক্ষা লাভ করা মানুষের একটি মানবিক ও নাগরিক অধিকার। কিন্তু বর্তমানে আমাদের যৌথ পরিবারগুলো ভেঙ্গে একক পরিবারে পরিণত হচ্ছে এবং এর মূল কারণ শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা প্রয়োজনের তাগিদে গ্রাম ছেড়ে শহুরে জীবন বেছে নিয়েছে। কারণ গ্রামের চেয়ে শহুরের জীবনে উন্নয়নে ছোঁয়া ও সুযোগ-সুবিধা বেশি। তারা বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে বেশি জড়িয়ে পড়ছে এবং যৌথ পারিবারিক বন্ধন রক্ষা করা তাদের জন্য ঝামেলার। ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা লাভে গ্রামের চেয়ে শহরে অনেক বেশি সুবিধাজনক যদিও তা ব্যয়বহুল তবুও তা যেন তাদের প্রধান একটি অগ্রাধিকার। তাই দিনে দিনে একক পরিবারের সংখ্যা এবং তা গড়ার প্রবণতা অনেক বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবারে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে সম্পর্কের দূরত্ব বাড়ছে। কেউ কাউকে সময় দিতে পারছেনা। জীবন বাঁচার তাগিদে সবাই কাজে, পড়াশুনা ও বিকল্প কিছু নিয়ে খুবই ব্যস্ত। টেলিভিশন, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ফেসবুক ইত্যাদির সঙ্গে বন্ধুত্ব বা সম্পর্ক অনেক বেশি। পারস্পরিক যোগাযোগ ও জীবন সহভাগিতা, পারিবারিক চিত্ত-বিনোদন ও পরস্পরের কথা শোনা, জীবনের প্রয়োজনগুলো বুঝে তা পূরণে আন্তরিক হওয়ার কারো যেন সময় হচ্ছে না। কথা হয় মোবাইল ফোনে, সারাদিন ব্যস্ততায় সময় কাটে নিজ নিজ কর্মস্থলে, খাবার-দাবার যার যার মতো ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, চিত্তবিনোদনের সময় কারো নেই ইত্যাদি...। এখন পরিবারে সকলের জীবনযাত্রা যেন যান্ত্রিক। পারিবারিক প্রার্থনা, খ্রিস্টীয় উপাসনায় অংশগ্রহণ, সুষ্ঠু নৈতিক বা চারিত্রিক আচার-আচরণ ও শিষ্টাচার ইত্যাদিতেও শিথিলতা। গুরুজনদের প্রতি সম্মানবোধ অনেকটা কমে যাচ্ছে। জীবনের উশৃঙ্খলতা, মাস্তানি বা সন্ত্রাসী মনোভাব ও প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক মনমানসিকতায় উন্নতমানের ও বিভিন্ন ধরনের মাদকের প্রতি আসক্ত (বিদেশী মদ, দামী সিগারেট, অন্যান্য নেশার অভ্যাস ইত্যাদি)। পরিবারে পিতামাতার জীবনাদর্শের অভাব, সন্তানদের প্রতি সঠিক যত্ন নেই, পাশ্চাত্যের জীবনযাত্রার প্রভাব, পারিবারিক মূল্যবোধ চর্চায় শিথীলতা, পারিবারিক নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন, গভীর রাত পর্যন্ত পরিবারের বাইরে

অবস্থান, জীবন সংলাপ নেই ইত্যাদি...।

সামাজিক জীবন

আমরা সমাজবদ্ধ জীব এবং সকলে একত্রে সামাজিকতা নিয়ে সুশৃংখল জীবনযাপন করতে চাই। কিন্তু বর্তমানে প্রযুক্তিগত উন্নয়নে সামাজিক অবকাঠামোর আমূল পরিবর্তন হচ্ছে। পূর্বের ন্যায় সমাজে পরস্পরের মধ্যে সেই সহজ সরল খোলা মনের সম্পর্ক। সামাজিক নিয়ম-নীতি, ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ইত্যাদি প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে কেমন যেন বিলুপ্তির পথে। বর্তমান যুগে যুব মন-মানসিকতা ডিজিটাল। প্রযুক্তির উন্নয়নে তারা নানা আবিষ্কারের উপকরণ ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। সব ক্ষেত্রে কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ফেসবুক এমনি অনেক কিছু ব্যবহারের মধ্যদিয়ে তারা নিজেদের ব্যস্ত রাখছে এবং সমাজের অনেক সামাজিকতা থেকে নিজেদের দূরে রাখছে; কারণ অতি সহজ উপায়ে তারা পৃথিবীর অনেক কিছু সম্পর্কে অবগত হচ্ছে। তাদের দৃষ্টিতে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা যেন সেকেলে ও অনেক পশ্চাৎপদ। অনেকের চিন্তা ও ব্যক্ত অভিমত যে সমাজে গুরুজনদের ও অভিভাবকদের পরিচালনা বা নেতৃত্ব যেন মান্দাতা আমলের। তাই ঐধরনের নেতৃত্ব তারা গুরুত্বসহকারে মানছে না। সামাজিক নিয়ন-নীতির দ্রুত পরিবর্তন তারা প্রত্যাশা করে এবং তাদের দৃষ্টিতে বর্তমান সমাজে চলমান অনেক কিছুরই পরিবর্তন প্রয়োজন। কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন তাদের অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর দেয়। আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব সমাজ জীবনে ব্যাপকভাবে পড়েছে;- যা দিনে দিনে সামাজিক বন্ধন ও পারস্পরিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করছে। সমাজের নেতৃত্ব ঢিলেঢালা হয়ে যাচ্ছে, ব্যক্তি-স্বার্থপরতার মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধ কমে যাচ্ছে। সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে মনের আন্তরিকতা ও সামাজিক নিয়ম-নীতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হচ্ছে না। অন্যদিকে, ব্যয়ভারও বিভিন্ন কারণে বাড়ছে। নিজস্ব সামাজিক কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত দিকসমূহ লুপ্ত হওয়ার পথে। এক কথায় বলা যায় প্রযুক্তির উন্নয়ন সমাজ জীবনের উপর ব্যাপকভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

মাণ্ডলীক জীবন

উন্নয়নমুখী তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার মাণ্ডলীক জীবনে ভালোর চেয়ে মন্দ প্রভাবই বেশি পড়ছে। তাই অনেক ক্ষেত্রে খ্রিস্টীয় উপাসনায়, বাণী প্রচারে ও ধর্মশিক্ষাদানে বিভিন্নভাবে মিডিয়ার উপকরণগুলো (পাওয়ার পয়েন্ট, ভিডিও ক্যামেরা, টেলিভিশন,হাইটেক সাউন্ড সিস্টেম ইত্যাদি) ব্যবহার প্রয়োজন বলে মনে হলেও; এসবের প্রতি অতি নির্ভরশীল হয়ে পড়লে আমাদের ভক্তি-বিশ্বাসের গভীরতায় শিথিলতা আসার সম্ভাবনা রয়েছে। খ্রিস্টীয় উপাসনা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে, ধর্মশিক্ষা ও বাণী প্রচার কাজে আমরা যন্ত্র-নির্ভর হয়ে পড়বো। তবে পরিবেশ পরিস্থিতির উপর এবং সময়োপযোগী করে প্রযুক্তির উপকরণ ব্যবহার করা প্রয়োজন। বর্তমানে প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে আবিষ্কৃত উপকরণসমূহের ব্যবহারে আমরা অতিরিক্ত সময় ব্যয় করছি এবং এসব নিয়ে দিনের বেশির ভাগ সময় ব্যস্ত আছি। প্রার্থনার সময় নেই, পারিবারিক প্রার্থনা নিয়মিত হচ্ছে না, উপাসনায় মনোযোগ আসছে না এবং কাজের ব্যস্ততায় আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি উদাসীন। আমরা আরামপ্রিয় ও বিলাসী মনোভাবে মানুষ হয়ে উঠছি। খ্রিস্টীয় উপাসনা ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্য দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যে জীবন সহভাগিতা ও অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন তাও দিনে দিনে সীমিত হয়ে যাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের গতি আগামী প্রজন্মের জন্য মাণ্ডলীক জীবনে অংশগ্রহণে ও সেবাকাজে দায়িত্ব নিতে অনেকটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে মানুষ তথ্য-প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রতি যতটুকু আগ্রহী, খ্রিস্টীয় উপাসনায় অংশগ্রহণ করা ক্ষেত্রে ততটুকুই অনাগ্রহী। তাই বলা যায়, পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলী অত্যাধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির যুগে নানাবিধ সমস্যার ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে এবং ইতিবাচক প্রভাবের চেয়ে নৈতিবাচক প্রভাবই বেশি।

এইসব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় বা উত্তরণের কিছু উপায় অবশ্যই রয়েছে। আমার অভিজ্ঞতার আলোকে এবং নিজস্ব চিন্তায় নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলো তুলে ধরলাম:-

প্রথমত: আমাদের সুস্থ মন-মানসিকতা ও চিন্তা-ভাবনার পুণগঠন করা প্রয়োজন। পারিবারিক শিক্ষা, নিয়ন-কানুন, রীতি-নীতি, অনুশাসন, পারস্পরিক সম্পর্ক, সকলের মধ্যে সহভাগিতা, পরস্পরের জন্য সময় দেওয়া, একত্রে প্রার্থনা করা, পরিকল্পনা করা ইত্যাদির উপর বেশি গুরুত্বারোপ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত: টেলিভিশন দেখা, মোবাইল ফোন ব্যবহার, ইন্টারনেট প্রয়োজনের অধিক ব্যবহার সীমিত করা, পারিবারিক চিত্তবিনোদন সমবেত ভাবে করা, ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে পিতামাতার নিয়মিত সংলাপ করা, সময় দেওয়া এবং আন্তরিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা। খোলা ও উদার মনের মানুষ হওয়া এবং যেকোন ভাল শিক্ষা ও জীবন গঠনে উদ্যোগী হওয়া। সন্তানদের পিতামাতা ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, অনুগত ও বাধ্য থাকতে শিক্ষা দেওয়া।

তৃতীয়ত: সমাজে সামাজিক নিয়ম-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সামাজিক ঐতিহ্য ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি রক্ষায় মিডিয়া ব্যবহার করা। সামাজিক অনুষ্ঠানাদি একত্রে উদ্‌যাপনে অংশগ্রহণ করা এবং সামাজিক সুশৃঙ্খলা রক্ষায় সংঘবদ্ধ হয়ে একত্রে কাজ করা। সমাজ নেতা বা প্রধানদের নেতৃত্বে সহযোগিতা করা এবং সকলের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা। নেশার প্রবণতা রোধ করা, যুবগোষ্ঠীকে সঠিক পথে পরিচালনা করা।

চতুর্থত: মণ্ডলী ও সমাজ একত্রে সমন্বয় রেখে মাণ্ডলীক ও সামাজিক শিক্ষা এবং গঠনদানে বিভিন্ন পর্যায়ে লোকদের জন্য শিক্ষা সেমিনারের ব্যবস্থা করা। তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া এবং মাণ্ডলীক শিক্ষায় কিভাবে এই অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির যুগে নানাবিধ উপকরণ ব্যবহার করা সম্ভব তা শিক্ষা দেওয়া। মণ্ডলীকে তাঁর সাধ্য মতো, বর্তমান যুগলক্ষণ অনুযায়ী এবং জনগণকে গঠনদানে অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির যুগে নানাবিধ উপকরণ ব্যবহার করতে শিক্ষা দিতে হবে।

পঞ্চমত: তথ্য-প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে ছেলে- মেয়েরা ও যুবক-যুবতীরা যেন অভ্যস্ত হতে পারে এবং এ ব্যাপারে পারিবারিক, সমাজিক, মাণ্ডলীক ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের সঠিক উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গুলোতে যেহেতু ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার জন্য **আইসিটি** বিষয়টি সিলেবাসে রয়েছে; তাই উক্ত বিষয়টি খুব গুরুত্বসহকারে ও সঠিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দিতে হবে। তথ্য-প্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহারের উপকারিতা বা মঙ্গলকর দিকটি সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক চেতনা দান ও এর বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

পরিশেষে, বলা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারে আমরা কেউ কাউকে নিষেধ করতে পারবো না; কিন্তু এর বাস্তব ক্ষতিকারক দিকসমূহ উপলব্ধি করে তথ্য-প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের জীবন গঠন, শিক্ষালাভ ও উন্নয়নশীল পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো॥